অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

পাগলা সাহেবের কবর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. গগন-ডাক্তারের বড় ছেলে 2
২. স্নান করে এসে হরি 11
৩. পরদিন সকালে গোবিন্দ 19
৪. রাত্রিবেলা একা ঘরে শুতে........................... 30
৫. চোখে রোদ লাগায় 43
৬. খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে 49
৭. খেয়েদেয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ........................... 60
৮. ওদিকে কুসুমকুঞ্জের একতলার 73
৯. গোপালদের পাড়াটা শহরের এক প্রান্তে 90

১. গগন-ডাক্তারের বড় ছেলে

গগন-ডাক্তারের বড় ছেলে হরিবন্ধু যে একটি গবেট তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রত্যেক ক্লাসেই এক-আধবার করে ঠেকে ঠেকে ক্লাস সেভেনে উঠে সেই যে সে অ্যালজেবরা, জিওমেট্রি, গ্রামার আর সংস্কৃতের বেড়াজালে পড়ে গেল, আর সেই জাল কেটে বেরোতেই পারে না। সেভেনেই তার বয়স তিন বছর আরও বেড়ে গেল। ছোট ভাই-বোনেরা পটাপট তাকে ডিঙিয়ে ওপরের ক্লাসে উঠে যেতে লাগল। হরির গোঁফের রেখা দেখা দিল, গালে উঠে পড়তে লাগল দাড়ি।

গগনবাবু খুবই শান্ত ও ধৈর্যশীল মানুষ। তাঁর তিন ছেলে আর দুই মেয়ের মধ্যে হরিকে বাদ দিলে আর কেউই তেমন ফেলনা নয়। আহামরি না হলেও সকলেই ভাল নম্বর পেয়ে ফি বছর নতুন ক্লাসে ওঠে। মেজো ছেলে খেলাধুলোয় ভাল, দু'মেয়েরই গানের গলা চমৎকার। ছোট ছেলে বেশ সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। হরি শুধু গবেট নয়, তার আর কোনও গুণই আছে বলে মনে হয় না।

সে তিনবার সেভেনে ফেল করার পর হেডমাস্টারমশাই নলিনীকান্ত রায় একদিন গগনবাবুকে ডেকে খুব ভদ্রভাবেই বললেন, "ডাক্তারবাবু, আপনি শহরের গণ্যমান্য লোক বলেই হরিবন্ধুকে এই স্কুলে এতদিন রেখেছি। আমরা এমনিতে ফেল করা ছাত্রকে রাখি না। হরিবন্ধুর জন্য এবার আপনাকে অন্য ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে স্কুলের রেকর্ড খারাপ হচ্ছে, ব্যাড প্রেসিডেন্স তৈরি হচ্ছে। আমরা ওকে এবারই টি সি দেব, স্কুল অথরিটি আমাদের সেবকমই অডার দিয়েছে।"

লাল টকটকে মুখ নিয়ে গগনবাবু তাঁর চেম্বারে ফিরে এলেন। চেম্বারে তখন অনেক রোগী অপেক্ষা করছে। কিন্তু গগনবাবু রাগে দুঃখে ক্ষোভে এমনই বিমনা হয়ে পড়েছেন যে, একজন রোগীর পেট টিপে পরীক্ষা করতে গিয়ে এমন আঙুলের খোঁচা দিলেন যে, সে

'আঁক' করে উঠল। আর-একজনের প্রেশার মাপতে গিয়ে এমন পাম্প করলেন যে, সেই রোগীর হাতে ঝিঁঝি ধরে গেল।

দুখিরামবাবুও গগনবাবুর রোগী। বিচক্ষণ প্রবীণ মানুষ। নামে দুখিরাম হলেও তিনি বিরাট বড়লোক। আট-দশরকমের ব্যবসা আছে। তিনি বিদেশেও মাল চালান দেন। এতক্ষণ তিনি চুপচাপ বসে ছিলেন। গগনবাবুর ভাবসাব দেখে তাঁর ভাল ঠেকল না। তাই তিনি তাঁর পালা এলে খাস চেম্বারে ঢুকে পড়ে গগনবাবুকে বললেন, "আপনার কি আজ মেজাজটা ভাল নেই?"

গগনবাবু দুখিরামবাবুকে খুবই খাতির করেন। অন্য কেউ এ-প্রশ্ন করলে চটে যেতেন। দুখিরামবাবুর ওপর চটলেন না। মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "কী আর বলব। আমার বড় ছেলেটা বড়ই গবেট। তিনবার ফেল করেছে। স্কুল থেকে টি সি: দিচ্ছে। কী যে করি।"

দুখিরামবাবু স্থিরভাবে বসে বললেন, "সবটা খুলে বলুন। দ্বিধা করবেন না।"

গগনবাবু বললেন, দুখিরামবাবু শুনলেন।

শুনে একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে, আপনার বড় ছেলে হরিবন্ধুর কোনও গুণই নেই?"

"থাকলে এতদিনে টের পেতাম।"

"মা বাপেরা অনেক সময়ে দোষ-গুণ কোনওটাই টের পায় না। তা সে যাকগে। আপনি মোতিগঞ্জের নাম শুনেছেন?"

"না। সেটা কোথায়?"

"সাঁওতাল পরগনায়। বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। তার চেয়ে বড় কথা, সেখানে চারুবালা বেঙ্গলি স্কুল বলে একটা স্কুল আছে। তার খুব নাম-ডাক।"

গগনবাবু হতাশার গলায় বললেন, "নাম-ডাকওয়ালা স্কুল আমার গবেট ছেলেকে নেবে কেন?"

"নেবে। তার কারণ ওই স্কুলের নাম-ডাক গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানোর জন্যই। একসময়ে সারা দেশের গবেট ছেলেরা ঝেটিয়ে আসত ওই স্কুলে পড়তে। এখন ততটা নয়। হোস্টেলও একটা ছিল, কিন্তু এখন তত ছাত্র হয় না বলে হোস্টেল তুলে মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টার বানানো হয়েছে। তবে তাতে কোনও অসুবিধে নেই। মোতিগঞ্জে আমার একটা কারবার আছে। স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে হালে সেখানে একখানা পুরনো বাড়িও কিনেছি। গৃহপ্রবেশ করারও সময় পাইনি। আপনার ছেলে দিব্যি সেই বাড়িতে থাকতে পারবে। দরোয়ান আছে, সে দেখাশোনা করবে, দরোয়ানের বউ দু'বেলা বেঁধে দেবে। কোনও অসুবিধে হবে না। ভেবে দেখুন, যদি রাজি থাকেন তবে আমাকে জানাবেন।"

এই বলে দুখিরামবাবু উঠলেন। আজ আর গগন-ডাক্তারকে নাড়ি দেখাতে তাঁর সাহস হল না। ডাক্তারের মুখ এখনও রক্তবর্ণ হয়ে আছে।

কিন্তু রেগে থাকলেও গগন বন্দ্যোপাধ্যায় ধৈর্যশীল শান্ত মানুষ। ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত তোলেন না। তবে গম্ভীর মানুষকে সকলেই ভয় পায়। তাঁর ছেলেমেয়েরাও তাঁকে যমের মতো ডরায়। গগনবাবু সারাদিন শরীরে রাগটা চেপে রাখলেন। রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর বড় ছেলেকে ডাকিয়ে আনলেন তাঁর ঘরে। তাঁর মনে হল, দুখিরামবাবুর প্রশ্নটার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম খোঁচা আছে, "আপনি কি এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে, আপনার বড় ছেলে হরিবন্ধুর কোনও গুণই নেই?" আসলে গগনবাবু একজন ব্যস্ত ডাক্তার। নিজের ছেলেমেয়েদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো সময় তাঁর নেই। কাজেই কার কোন্ গুণ আছে সে বিষয়ে তাঁর ভাল ধারণা

-ও থাকতে পারে। দুখিরামবাবু তাই খোঁচাটা দিয়ে গেছেন। গগনবাবুর মনে হল, তাঁর বড় ছেলে হরিবন্ধুর বাস্তবিকই কোনও গুণ আছে কি না, তা তাঁর একটু খোঁজ করা উচিত।

হরি সামনে এসে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়ানোর পর গগনবাবু বললেন, "হরি, লেখাপড়া যা করেছিস তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এখন বল্ তো, কোন্ সাবজেক্টটা তোর কাছে তত কঠিন বলে মনে হয় না।"

হরিবন্ধু এই প্রশ্নে খুবই ভড়কে গিয়ে অনেকক্ষণ আমতা-আমতা করে বলল, "ইয়ে, বাংলা কবিতাটা বেশ সোজা।"

"বাঃ, বাঃ, তা হলে কবিতার দিকে ঝোঁক আছে! বেশ, এবার বল্ তো, লেখাপড়া ছাড়া আর তোর কোন গুণ আছে বলে মনে হয়? সোজা কথায় তুই আর কী কী পারিস?"

হরিবন্ধু ফের আকাশ-পাতাল ভাবল, তারপর মাথা চুলকে-টুলকে বলল, "ইয়ে..বোধহয় গাছ বাইতে পারি।"

"বাঃ, বেশ। টারজান। টারজানও বেশ ভাল গাছ বাইতে পারত। তা আর কী পারিস?"

"গুলতিতে পাখি মারতে পারি।"

"বাঃ, এটাও তো গুণই ধরতে হবে। তার মানে লক্ষ্যভেদ করতে পারিস। অর্জুনের এ-গুণ ছিল, একলব্যের ছিল, কর্ণের ছিল। বাঃ, বাঃ। আর কী কী করতে ভাল লাগে তোর?"

হরি নির্দ্বিধায় বলল, "খেতে।"

গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "এটা খারাপ কিছু নয়। খেতে সকলেই ভালবাসে। স্যার আশুতোষও বাসতেন। আর?"

"আর? আর ঘুমোতে।" গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "নট ব্যাড। ঘুম জৈব ধর্ম। নেপোলিয়ন ঘোড়ার পিঠে বসে যুদ্ধ করতে করতে ঘুমোতেন। তোর পড়তে পড়তে ঘুম পেতেই পারে। আর কী ভাল লাগে তোর?"

একটু লাজুক গলায় হরি বলল, "আর স্কুল-পালাতে।"

গগনবাবু গেল বার হরিদ্বারে বেড়াতে গিয়ে একখানা কাঠের লাঠি কিনে এনেছিলেন। সেটার দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গিয়ে বললেন, "স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্কুল করতে পছন্দ করতেন না, তোর আর দোষ কী?"

হরি বিনয়-বিগলিত মুখে মাথা নিচু করে রইল। গগনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "কিন্তু এত গুণ থেকেও তো তোর কোনও উন্নতি হচ্ছে না রে হরি। আমার মনে হয়, এবাড়ির আবহাওয়ায় তোর আর উন্নতি হবেও না। তাই আমি ঠিক করেছি তোকে মোতিগঞ্জে পাঠাব। সেখানে আমার চেনা এক ভদ্রলোকের মস্ত বাড়ি আছে। সেখানে থাকবি, স্কুলটাও ভাল। কয়েক দিনের মধ্যেই যেতে হবে। তৈরি থাকিস।"

বাবা হলেন হাইকোর্ট, তাঁর ওপরে আর কথা নেই। মা-ঠাকুমা মেলা কান্নাকাটি করলেন বটে, কিন্তু হরিকে শেষ অবধি টিনের স্যুটকেস আর শতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানা নিয়ে মোতিগঞ্জে যেতেই হল।

এইবার মোতিগঞ্জ জায়গাটার একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। এক কথায় এমন সুন্দর জায়গা বিরল। চারদিকে ছোটখাটো পাহাড়ের শ্রেণী আর শাল-মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা। জঙ্গলে বাঘ আছে, ভালুক আছে, হায়না এবং বুনো কুকুর আছে। আবার সৌন্দর্যও বড় কম নেই। বিভিন্ন ঋতুতে জঙ্গলের গাছে-গাছে নানারকম ফুল ফোটে। মোতিগঞ্জ ঠিক শহর নয়, ছোট একখানা গঞ্জ। তবে স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে এখানে কলকাতার অনেক বড়লোক বাড়ি করে ফেলে রেখেছেন। সারা বছরই বলতে গেলে বাড়িগুলো খালি পড়ে থাকে। একজন মালি বা দরোয়ানের হেফাজতে। মোতিগঞ্জের কাছাকাছি একটি অভ্রখনি

ছিল, সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। জগবন্ধু সাহা নামে একজন বাঙালি ব্যবসাদার ওই খনি কিনে একদা প্রচুর পয়সা করেছিলেন। মানুষটির দানধ্যানের জন্য খ্যাতি ছিল। তিনিই মোতিগঞ্জের চারুবালা বেঙ্গলি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। স্কুলটি যাতে ভাল চলে, সেজন্য জগবন্ধু সাহা খুঁজে-খুঁজে ভাল-ভাল শিক্ষককে বেশি মাইনে দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। একটি চমৎকার ছাত্রাবাসও তিনি তৈরি করে দেন। নিজে ভাল লেখাপড়া জানতেন না বলে শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। চারুবালা তাঁর মা। জগবন্ধু বা চারুবালা কেউই আজ আর বেঁচে নেই। তবে স্কুলটি আছে। চারুবালা বেঙ্গলি স্কুলের বৈশিষ্ট্য হল, যে-কোনও ছাত্রকেই এখানে ভর্তি করা হয়। চূড়ান্ত গবেটকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। তারপর তাদের কড়া ডিসিপ্লিন ও হাড়ভাঙা খাটুনির ভিতর দিয়ে মানুষ করে দেওয়া হয়। সেখানে ফাঁকির স্থান নেই।

স্কুল থেকে আধমাইল দূরে শহরের প্রায় প্রান্তে একখানা বাগান-ঘেরা বাড়ি। বাড়িখানা পুরনো, যত্নের অভাবে রং চটে গেছে। তবে বেশ বড় বাড়ি। গগনবাবুর রুগি দুখিরামবাবু শখ করে বাড়িখানা কিনেছিলেন। মাঝে-মাঝে হাওয়া বদল করতে আসবেন বলে। এ বাড়িরই একতলার সামনের দিকে কোণের একখানা ঘরে হরির জায়গা হল। দরোয়ান থাকে গেটের পাশে ছোট্ট ঘরে। দরোয়ানের বউ আছে, দুটো ছেলে-মেয়ে আছে। বাগানখানা ভারী চমৎকার। পেয়ারা, আম, জাম, আতা, কুল, সবেদা, ফলসা, বেল কোনও গাছেরই অভাব নেই। ফুলও ফোটে মেলা।

হরির ঘরখানা বেশ ভাল। মস্ত পালঙ্ক আছে, বইয়ে ঠাসা গোটা দুই আলমারি, টেবিল-চেয়ার কিছুরই অভাব নেই। দেওয়ালে কয়েকটা অয়েল পেন্টিং আছে। একটা ছবি এক বুড়ো মানুষের। গোটাতিনেক ছবি বিদেশের নিসর্গ দৃশ্যের। লাগোয়া বাথরুমও আছে। জানলা খুললেই বাগান। এত সুন্দর পরিবেশে হরি কখনও থাকেনি।

দুখিরামবাবু এবাড়িতে কখনও থাকেননি। এসব আসবাবপত্র, ছবি, বই কিছুই তাঁর নয়। হারানো বাড়িতে বহুকাল ধরেই এগুলো ছিল, তিনি এসব সমেতই বাড়িখানা কিনেছেন।

মোতিগঞ্জে হরিবন্ধুকে পৌঁছে দিতে সঙ্গে এসেছিল বাড়ির পুরনো ভৃত্য গোবিন্দ। সকালবেলায় স্টেশনে নেমে একখানা টাঙ্গা ধরে তারা যখন এসে বাড়ির ফটকে নামল, তখনই গোবিন্দ খুব ভাল করে চারদিকটা দেখে নিয়ে বলল, “এ বাপু আমার বিশেষ সুবিধের ঠেকছে না।”

হরিবন্ধু বলল, “কিসের অসুবিধে?”

“গণ্ডগোল আছে।”

“কিসের গণ্ডগোল?”

“কাজটা ভাল হল না।”

“কোন কাজটা?”

“এই যে তোমাকে এখানে পাঠানো হল, একাজটা ভাল হয়নি। বাড়িটা কেমন যেন অলুক্ষুনে ঠেকছে।”

হরিবন্ধুর কাছে গোটা ব্যাপারটাই অলুক্ষুনে। মা বাবা-ভাই-বোন এবং সর্বোপরি ঠাকুমাকে ছেড়ে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আসতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। ঠাকুমার গায়ের সঙ্গে লেটে না শুলে তার ঘুম আসে না। মা ভাত বেড়ে না দিলে খেয়ে তার পেট ভরে না। সে একটু বোকা বলেই বোধহয় তার ছোট ভাই-বোনেরা তাকে ভীষণ ভালবাসে। গাছ থেকে আম, জাম, কুল পেড়ে দিয়ে সে-ও তো ওদের খুশি করতে ভালবাসে। গাছকে মাটি থেকে উপড়ে ফেললে গাছের কেমন অনুভূতি হয়, তা হরি জানে না বটে, কিন্তু চলে আসার সময়ে তার মনে হচ্ছিল যে, তাকে কেউ যেন মাটি থেকে শিকড়সমেত উপড়ে ফেলছে। এই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা। বাড়ি থেকে তো একরকম তাড়িয়েই দেওয়া হল তাকে। সে কি আর ফিরে যেতে পারবে কোনওদিন?

যাই হোক, বাক্স-বিছানা নিয়ে নামতেই একজন গম্ভীরমতো দরোয়ান এসে বিনা প্রশ্নে ফটক খুলে দিল। একটিও কথা না বলে সে গটগট করে হেঁটে গিয়ে নীচুতলার একখানা ঘর খুলে দিয়ে চলে গেল। তার হাবভাব দেখে হরির একটু কেমন-কেমন লাগছিল। ঠিক যেন মানুষ নয়, যন্ত্রমানব। ভাবলেশহীন পাথুরে মুখ, বিশাল মজবুত চেহারার এই লোকটাই যে এখানে তার খবরদারি করবে এটা ভেবে তার মনটা কিন্তু-কিন্তু করতেই লাগল।

দরোয়ান যেমনই হোক, ঘরখানা কিন্তু ভাল। বেশ খোলামেলা। জানলা খুললেই সবুজ গাছপালা আর বাগান দেখা যায়। জানলা বেয়ে কেঁপে উঠেছে বোগেনভেলিয়ার পুষ্পিত ডালপালা। ঘরে বেশ আলো-হাওয়া আছে।

গোবিন্দ খুব খুঁতখুঁতে চোখে চারদিকটা দেখে নিল। ভিতরদিককার দু'খানা বন্ধ দরজা ঠেলেঠুলে দেখল। জানলার পাল্লা, গ্রিল, দরজার কাঠ পরীক্ষা করল। বাথরুমে ঢুকে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর বলল, "বাড়িখানা পুরনো হলেও মজবুত। ব্যবস্থাও যা দেখছি ভালই। তবে বলছি বাপু, এবাড়ি আমার ভাল ঠেকছে না।"

হরি মন খারাপ করে জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। বাড়ির কথা ভেবে তার চোখ ভরে জল আসছে। গোবিন্দর কথা তার কানেও গেল না। দুখিরামবাবু একখানা চিঠি দিয়ে দিয়েছেন। সেখানা নিয়ে আজই স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজই স্কুলে ভর্তি করে নেওয়া হবে তাকে। তারপর এখানেই থেকে যেতে হবে তাকে। কতকাল কে জানে।

গোবিন্দ তার অবস্থা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ভেবে আর কী করবে। আজ আবার ইস্কুলে যেতে হবে। চানটান করে তৈরি হও। আমি একটু দেখিগে ব্যাটা প্যাঁচামুখো দরোয়ানটা রান্নাবান্নার কী বিলি ব্যবস্থা করল।"

হরি চোখের জল মুছে উঠল এবং স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল। ফলে কাল সকালের গাড়িতে গোবিন্দদাও ফিরে যাবে। তারপর

সে একদম একা। ভাবতেই বুকটা হাহাকার করে উঠল তার।

ফটকের পাশেই আউট-হাউস। সেখানে দরোয়ান জগুরাম থাকে। গোবিন্দ গিয়ে খুব তেজী গলায় ডাকল, "জগুরাম! বলি জগু আছিস নাকি রে?"

দরজা খুলে বিশাল চেহারার জগুরাম দেখা দিল। চোখে রক্তজল করা দৃষ্টি। সেই সাঙ্ঘাতিক চোখে সে গোবিন্দকে নীরবে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

গোবিন্দর গলা তিন পদ নেমে গেল হঠাৎ। বিগলিত একটু হেসে সে বলল, "এই যে জগুভায়া, আপনার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। তা ইয়ে, খাবারটাবার কি কিছু মিলেগা? এই ধরো চাট্টি ভাত, একটু ডাল..."

জগুরাম সেইরকমই নিষ্কম্প চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে খুবই মৃদু স্বরে বলল, মিলেগা।"

"তথাস্তু।" বলে গোবিন্দ পালিয়ে বাঁচল, মনে-মনে ভাবল, ব্যাটা একেবারেই পাষণ্ড, আর একটুক্ষণ ওরকম চেয়ে থাকলে ভস্মই করে দিত আমাকে।

ফটকের বাইরে এসে গোবিন্দ চারধারটা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। পাড়াটা এতই নির্জন যে, এই সকালবেলাতেও একটিও মানুষ নেই পথে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব বাগানে ঘেরা নির্জন বাড়ি। কোথাও মানুষ তো থাকে বলে মনে হয় না। দুখিরামবাবুর বাড়ির দু'পাশে যে দুটি বাড়ি আছে সেগুলোতে দরোয়ানও নেই। ফটকে জংধরা তালা ঝুলছে। ভিতরের বাগান আগাছায় ছেয়ে গেছে। বাড়ির দেওয়ালে শ্যাওলা ধরেছে।

২. স্নান করে এসে হরি

স্নান করে এসে হরি জামাপ্যান্ট পরে চুল আঁচড়াচ্ছিল, এমন সময় ঘোমটা-টানা একটা বউ থালায় ভাত ডাল তরকারি বেড়ে নিয়ে এসে কোণের টেবিলটায় রাখল।

থালায় ভাতের পরিমাণ দেখে হরি আঁতকে উঠে বলল, "আমি অত ভাত খেতে পারব না। কমিয়ে আনুন।"

বউটা একথার কোনও জবাব দিল না। নিঃশব্দে চলে গেল।

ভাল জ্বালা হল হরির। এই নির্জন বাড়িতে কথা বলার মতো লোক বলতে ওই দু'জন। দরোয়ানটা গোমড়ামুখো, বউটাও যদি তাই হয় তো মহা মুশকিল।

ভাতের রুচিও ছিল না হরির। স্কুলের চিন্তায় তার পেটে পাক দিচ্ছে। শুনেছে, খুবই কড়া স্কুল। তার ওপর বাড়ির জন্য মন খারাপ তো আছেই। ফেলে-ছড়িয়ে খানিকটা ভাত খেয়ে সে উঠে পড়ল। গোবিন্দদা এখনও ফেরেনি। সহজে ফিরবেও না। দারুণ আড্ডাবাজ লোক। তার

জন্য অপেক্ষা না করে দুখিরামবাবুর চিঠি আর স্কুলে ভর্তি হওয়ার টাকা পকেটে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। ঘরটা ভোলা রইল। থাক, দরোয়ান আছে, আর তা ছাড়া তার চুরি যাওয়ার মতো তেমন কিছু নেইও।

আধমাইল হেঁটে সে যখন স্কুলের দরজায় পৌঁছল তখন তার বুকটা দমে গেল। এরকম নিরাপদ স্কুলবাড়ি সে দ্যাখেনি। সাদা একটা দোতলা ব্যারাকবাড়ি। খুব উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দেখলে স্কুল নয়, জেলখানা বলে মনে হয়। হরি যখন স্কুলে ঢুকছে, তখন স্কুল বসবার ঘণ্টা বাজছিল। ঘণ্টার শব্দটাও যেন কেমন, গম্ভীর, মন উদাস করে দেয়। স্কুলের মধ্যে ছেলেদের কোনও হইহই নেই। সব শান্ত, ঠাণ্ডা।

খুব ভয়ে-ভয়ে সে দেউড়ি পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল। একটা বজ্রগম্ভীর গলা বলে উঠল, “কী চাই?”

হরি সভয়ে দ্যাখে ব্যারাকবাড়ির একতলার বারান্দার কোণে, ফটকের মুখেই এক বিশাল চেহারার ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, রংটি ঘোর কালো, হাতে বেত, চোখে প্রখর দৃষ্টি।

কাঁপা গলায় হরি বলল, “আমি হেডস্যারের সঙ্গে দেখা করব।”

ভদ্রলোক হাতের বেতখানা তুলে তাঁর পিছনের দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “ওই ঘরে গিয়ে বোসো।”

হরি ভয়ে-ভয়ে বারান্দায় উঠল এবং ভদ্রলোকের পাশ দিয়ে একটা পিঁপড়ের মতো গলে গিয়ে ঘরটায় ঢুকল। ঘরে একটা সবুজ রেকসিনে-মোড়া ডেস্ক আর গুটিকয় চেয়ার, কয়েকটা আলমারি, আলমারির মাথায় গ্লোব, ফাঁইল ক্যাবিনেট, হাজিরা-খাতা, নোটিসবই সব রয়েছে। হরি বসল না। হেডস্যারের ঘরে বসতে নেই, সে জানে। সে একটু কোণের দিকে সরে দাঁড়িয়ে রইল।

স্কুল বসবার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে মাস্টারমশাইরা অনেকটা মিলিটারিদের মতো গটমটে পায়ে একে-একে ঢুকে একটা করে হাজিরা-খাতা তুলে নিয়ে ক্লাসমুখে চলে যেতে লাগলেন। এরকম স্বাস্থ্যবান সব মাস্টারমশাই হরি কদাচিৎ দেখেছে। প্রত্যেকেরই বেশ চওড়া কব্জি, বিশাল-বিশাল বুকের ছাতি, কারও মুখে হাসির লেশমাত্র নেই, আর প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টিই ভয়ঙ্কর।

মাস্টারমশাইরা ক্লাসে চলে যাওয়ার পর সেই বেতওয়ালা ভদ্রলোক

এসে ঘরে ঢুকলেন। নিজের চেয়ারে বসে তার দিকে চেয়ে বললেন, “তুমি দুখিরামবাবুর চিঠি নিয়ে এসেছে, না? দাও দেখি চিঠিখানা।”

হরি চিঠিটা দিল। "টাকা এনেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যাও, এর পাশের ঘরেই অফিস। ভর্তি হয়ে সোজা দোতলায় উঠে বাঁ দিকের প্রথম ঘরে চলে যাবে। সেটাই ক্লাস সেভেন ডি সেকশন।"

"আজ্ঞে।"

ভর্তি হতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। একজন একশো বছর বয়সী বুড়ো লোক টাকা গুনে নিয়ে একটা লেজারে তার নামধাম লিখল। একখানা রসিদ আর বুকলিস্ট ধরিয়ে দিয়ে বলল, "ক্লাসে চলে যাও।"

দোতলার ক্লাসঘরে তখন টকটকে ফর্সা ব্যায়ামবীরের মতো চেহারার এক মাস্টারমশাই ইংরিজির ক্লাস নিচ্ছিলেন। সে দরজায় দাঁড়াতেই কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "বাঁ দিকে থার্ড বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়ো।"

ক্লাসে জুনা-ত্রিশ ছেলে। প্রত্যেকেই নিশ্চপ। মাস্টারমশাই একজন ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, "বিউটিফুল বানান কী?"

"বি ইউ…"

"বারান্দায় কান ধরে নিলডাউন।" ছেলেটা নিলডাউন হল। "বলাই, জাঁকজমক ইংরিজি কী?"

"প… প… প…. "

"পাঁচ বেত। এদিকে এসো।"

পাঁচ ঘা বেতের শব্দ হরি চোখ বুজে শুনল। কী শব্দ রে বাবা। অন্য ছেলেকে মারা হচ্ছে, আর হরি যেন নিজের শরীরে টের পাচ্ছে।

ক্লাসের ছেলেদেরও হরি লক্ষ করল। এ-ক্লাসে সব ছেলেই বেশ ধেড়ে এবং তাগড়াই চেহারার। কারও বয়সই হরির চেয়ে কম নয়, বরং বেশিই হবে। কেমন যেন বন্য, ক্ষুধার্ত দৃষ্টি সকলের চোখে।

ছেলেগুলো যে সুবিধের নয়, তা বোঝা গেল মাস্টারমশাই প্রথম পিরিয়ড পড়িয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তিনটে মুশকো চেহারার ছেলে তিনদিক থেকে গদাম গদাম করে এসে লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। দু'জন দুটো হাত চেপে ধরল, একজন তার চুলের মুঠি ধরে মুখটা তুলে বলল, "দেখি, দেখি চাঁদ, কোন্ গগন থেকে উদয় হলে!"

আকস্মিক এই আক্রমণে হরি এমন ঘাবড়ে গেল যে, তার মুখে কথাই ফুটল না। সভয়ে চেয়ে রইল শুধু। যে ছেলেটা চুল ধরেছিল, সে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "বোবা নাকি হে? কিন্তু বোবারও যে এখানে মারের চোটে বুলি ফোটে তা জানো?"

পিছন থেকে কে যেন ঘাড়ে একখানা রদ্দা মেরে বলল, "না রে, বেশ ঘাড়ে-গদানে আছে। ভাল পানচিং ব্যাগ হতে পারবে।"

সকলে হিহি করে হাসল।

এই স্কুলে মাস্টারমশাইরা ক্লাসে আসতে মোটেই দেরি করেন না। বারান্দায় গটমটে জুতোর শব্দ পেয়েই ছেলে তিনটে তাকে ছেড়ে দিল। একজন শুধু চাপা স্বরে বলল, "নালিশ করলে আস্ত রাখব না, মনে থাকে যেন!"

রাগে দুঃখে হরির চোখে জল এসে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সে নালিশও করল না।

দ্বিতীয় পিরিয়ডে বাংলা ব্যাকরণ পড়াচ্ছিলেন ঠিক মহিষাসুরের মতো চেহারার এক মাস্টারমশাই। সন্ধি সমাস প্রত্যয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হাতের বেতও ফোঁসফোঁস করতে লাগল। সাতজন বেত খেল, তিনজন নিডাউন হল, চারজনের মাথায় পড়ল ডাস্টারের ঘা।

দ্বিতীয় পিরিয়ড শেষ হতেই আবার গোটা চারেক ছেলে উঠে এসে ঘিরে ফেলল হরিকে।

"বাঃ, বেশ রাঙামুলোর মতো চেহারাটি তো তোমার ভাই। কিন্তু এ চেহারা কি রাখতে পারবে? শুকিয়ে যে হকি হয়ে যাবে বাছাধন?"

"দেখি তো ভাই তোমার হাতের লেখা কেমন। খাতায় লেখো তো 'আমি একটি গাধা। লেখো, লেখো- . "

"কাতুকুতু তোমার কেমন লাগে খোকা? ভাল নয়?"

"জিভ ভেঙাতে পারো? একটু ভেঙাও তো!"

প্রতি পিরিয়ডের পরই এরকম চলতে লাগল। টিফিন পিরিয়ডে তাকে একরকম ধরেবেঁধেই স্কুলের পাশের মাঠটায় নামানো হল।

হুকুম হল, "গোরু সেজে ঘাস খাও।"

তা-ই করতে হল হরিকে।

তারপর হুকুম হল, "চোখের পাতা একবারও না ফেলে পাঁচ মিনিট চেয়ে থাকো।"

তা-ই করতে হল।

ফের হুকুম, "এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সারা মাঠ চক্কর দাও।"

হরি তাও করল।

যখন ছাড়া পেল, তখন সে হেঁদিয়ে পড়েছে।

ছুটির পর যখন ক্লাসের ছেলেরা দুদ্দাড় করে বেরোচ্ছিল, তখন হরি বুদ্ধি করে তাদের সঙ্গে বেরোনোর চেষ্টা করল না, ক্লাসেই চুপ করে বসে রইল। কারণ ছেলেগুলো রাস্তায় তার ওপর ফের হামলা করতে পারে। স্কুল ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর সে গুটিগুটি বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

কিছুদূর হাঁটার পরই হরি একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল, কেউ তার পিছু নিয়েছে। কেউ পিছু নিলে বা তাকিয়ে থাকলে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে তা ধরা পড়েই, এর কোনও ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু টের ঠিকই পাওয়া যায়। হরিও পেল। চৌপথিতে ডান হাতে মোড় নিতে গিয়েই সে ছেলেটাকে লক্ষ করল। কালো, লম্বামতো। সে ফিরে তাকাতেই ছেলেটা হাত তুলে থামতে ইশারা করল।

হরি আর দাঁড়াল না। হাঁটা ছেড়ে ছুটতে শুরু করে দিল। পিছন থেকে ছেলেটা ডাকল, "এই খোকা, শোনো, শোনো। ভয় নেই, আমি ওদের দলের নই।"

হরি দাঁড়াল, সন্দিহান চোখে ছেলেটার দিকে চেয়ে রইল।

ছেলেটা কাছে এসে বলল, "আমার নাম গোপাল। আমি তোমার সঙ্গেই এক ক্লাসে পড়ি। আজ তোমাকে ওরা যা করছিল, দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছে। কিন্তু তোমার ভাই, ভীষণ সহ্যশক্তি।"

হরি স্বস্তির খাস ছেড়ে বলল, "ওরা ওরকম কেন বলো তো!"

গোপাল মৃদু একটু হেসে বলল, "এখানে ওরকম সব ছেলেই সংখ্যায় বেশি। তুমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলো না! পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম কয়েকটা দিন যা একটু কষ্ট। নতুন ছেলে এলেই এসব হয়।"

দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় থাকো?"

"কাঠগোলার দুখিরামবাবুর বাড়িতে।"

"সেটা কোথায়?"

"এই দিকে।" বলে হাত তুলে রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে হরি বলল, "রাস্তার শেষ দিকটায়। বাগান-ঘেরা বাড়ি।"

গোপাল বলল, "ওটা হল সাহেবপাড়া। এককালে সাহেবরা থাকত। এখন আর ও-পাড়ায় কেউ থাকে না। আমরা মাঝে-মাঝে পেয়ারা লিচু পাড়তে যাই। তোমাদের বাড়িটার কোনও নাম আছে?"

"খেয়াল করিনি তো!"

"কুসুমকুঞ্জ নয় তো! শুনেছিলাম কে এক বড়লোক কুসুমকুঞ্জ কিনে নিয়েছে।"

"হতে পারে।"

"যদি কুসুমকুঞ্জ হয়, তবে..."

"তবে কী?"

"না, বাড়িটার তেমন সুনাম নেই কিনা।"

"সুনাম নেই কেন? ভূত আছে নাকি?"

"কে জানে বাবা। এ-পাড়ার সব বাড়িই পুরনো। ভূত থাকতেই পারে। আমার ভীষণ ভূতের ভয়। তোমার?"

"আমারও।"

সামনের চৌপথিতে এসে গোপাল বলল, "আমি এবার বাঁ দিকে যাব। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ হল। কাল থেকে তুমি আমার পাশে বসবে। বাঁ দিকে থার্ড বেঞ্চ।"

হরি মাথা নেড়ে বলল, "আচ্ছা।"

একজন বন্ধু পাওয়ায় হরির বেশ ভালই লাগছিল। গোপালের কথা ভাবতে ভাবতেই সে দুখিরামবাবুর বাড়ির ফটকে এসে পৌঁছল। ফটকের দু'ধারে দুটো মস্ত থাম। দুটোর গায়েই লতা বেয়ে উঠে ঢেকে ফেলেছে প্রায়। বাঁ দিকের থামের গায়ে একটা শ্বেতপাথরের ফলক লতার আড়ালে ঢেকে গেছে। হরি লতাপাতা সরিয়ে বিবর্ণ ফলকটা লক্ষ করল। অক্ষরগুলো প্রায় মুছে গেছে, তবু পড়া যায়। হরি দেখে নিশ্চিন্ত হল যে, বাড়িটার নাম কুসুমকুঞ্জ নয়। এমনকী বাংলা নামই নয়। ইংরিজিতে লেখা 'গ্রিন ভ্যালি।'

৩. পরদিন সকালে গোবিন্দ

পরদিন সকালে গোবিন্দ চলে গেল। যাওয়ার আগে বলল, "আমি জায়গাটা বিশেষ ভাল বুঝছি না বাপু। বড় যেন কেমন-কেমন। তা বড়বাবুকে গিয়ে আমি বলব'খন যেন এখানে তোমাকে আর না রাখেন। ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাওয়া ভাল।"

একথায় হরির চোখে জল এসে গেল। বাবা যে তাকে একরকম বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, একথাটা তার অল্প বুদ্ধিতেও বুঝতে কষ্ট হয়নি। অভিমানে তার বুক ভারী হয়ে উঠল। সে মাথা নেড়ে বলল, "না গোবিন্দদা, এ-জায়গা ছেড়ে আমি যাব না। মরি তো মরব।"

"বালাই ষাট, মরবে কেন?" বলে গোবিন্দ তার পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বলল, "চারদিকে লক্ষ রেখো। রাত্রিবেলা টর্চবাতি আর লাঠি হাতের কাছে রাখবে। ঠক-জোচ্চোরদের পাল্লায় পোড়ো না। পেট ভরে খেও। আর পাগলা-সাহেবটাকে দেখলে সেলাম কোরো।"

হরি অবাক হয়ে বলল, "পাগলা-সাহেব! সে আবার কে?"

গোবিন্দ হাত উলটে বলল, "কী করে তা বলি! দুপুরে একটু হাঁটাহাঁটি করতে পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম। দেখি একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে এক সাহেব যাচ্ছে। হঠাৎ আমার দিকে কটমট করে চেয়ে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে পেল্লায় ধমক দিল, 'অ্যাও, সেলাম কাহে নাহি কিয়া? আমি তো ভয়ে মূর্ছা যাই আর কি। চিচি করে কী বললাম, সাহেব তা বুঝল না। হাতের চাবুকটা তুলে সপাং করে চালাল। ভাগ্যিস লাগেনি। পড়ি কি মড়ি করে পালিয়ে বাঁচি। ফিরে এসে জগুরামকে সব বলছিলাম। কিন্তু ব্যাটা এমন পাষণ্ড যে, একটা জবাবও দিল না। শুধু রাক্ষুসে চোখে একবার চেয়ে যেমন বাগানের ঘাস নিড়ড়াচ্ছিল তেমনি নিছড়াতে লাগল। একটা বিড়ি দিতে গেলুম, নিল না। দুটো মন-ভেজানো কথা

বললুম, কানেই তুলল না। দুর্গা, দুর্গা, কী হবে কে জানে। আমি হলে বাপু আর এক দণ্ডও এখানে থাকতুম না। তোমার জন্য বড় চিন্তা রইল।”

হরি গম্ভীর মুখে বলল, “আমার কথা আর চিন্তা কোরো না। আমাকে ভুলে যাও গোবিন্দদা।”

গাড়ির সময় হয়ে গিয়েছিল বলে কথা আর গড়াল না। গোবিন্দ রওনা হয়ে যাওয়ার পর স্নান-খাওয়া সেরে দুরুদুরু বুকে স্কুলে রওনা হল হরি।

ক্লাসে ঢুকতেই বাঁ দিকের থার্ড বেঞ্চ থেকে গোপাল তাকে ডাকল, “এই যে ভাই, এখানে এসে বোসো। তোমার জন্য জায়গা রেখেছি।”

হরি গিয়ে ঝুপ করে গোপালের পাশে বসে পড়ল। আর বসবার পরেই বুঝল, ক্লাসটা কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল। সকলেই তার দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কেউ কিছু বলছে না বা করছে না।

গোপাল মৃদু স্বরে বলল, “ভয় পেও না। আজ হয়তো ওরা তোমাকে কিছু করবে না।”

“কেন, করবে না কেন?”

“ওরা বোধহয় কালকের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত।”

আশ্চর্যের বিষয়, রাস্তবিকই আজ দুষ্টু ছেলেগুলো হরির দিকে একেবারেই মনোযোগ দিচ্ছিল না। নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি, ঝগড়া-মারামাবি করছিল বটে, কিন্তু হরিকে ‘রাঙামুলো’ বলে ডাকল না একবারও, কিল চড় ঘুসিও কেউ দিল না।

গোপাল মৃদু স্বরে ছেলেদের চিনিয়ে দিচ্ছিল, “লাস্ট বেঞ্চের বাঁ দিকের কোণে যে ছেলেটা বসে আছে, তাকে ভাল করে দেখে নাও। ও হল ভজন। ডেনজারাস ছেলে। দুর্দান্ত ফুটবল খেলোয়াড় আর তেমনি মারকুট্টা। ওপাশের ফোর্থ বেঞ্চে বসে আছে তিনটে ছেলে। ওদের

বলা হয় থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। গদাধর, অনিল আর দীপঙ্কর। লোকে বলে, ওরা একটা ডাকাতের দলে আছে। আমাদের পিছনের বেঞ্চে ডান দিকের কোণে বসে আছে রাজর্ষি। চেহারাটা খুব লালটু। দারুণ বড়লোকের ছেলে। ও নাকি ওদের একজন চাকরকে বন্দুকের গুলিতে জখম করেছিল বেয়াদবির জন্য। খুব সাংঘাতিক ছেলে। ও-পাশের সেকেণ্ড বেঞ্চে দ্যাখো, কোণের ওই যে নীল শার্ট আর তার পাশে হলুদ গেঞ্জি পরা দু'জন, ওদের নাম পার্থ আর শিবশঙ্কর। পার্থ খুব ভাল ওয়েট লিফটার আর শিবু কারাটিকা। ওই দু'জনের মতো পাজি খুব কম আছে। এদের আপাতত চিনে রাখো। সাধ্যমতো এড়িয়ে চোলো।"

হরি সব ক'জনকেই চিনতে পারল। এরাই কাল তার ওপর অত্যাচার করেছে সবচেয়ে বেশি।

সে গোপালের দিকে চেয়ে বলল, "কিন্তু ওরা আজ আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে কেন বলো তো! তোমার জন্য?"

গোপাল মাথা নেড়ে বলল, "না, না। আমার জন্য কেন হবে?"

হরি তবু গোপালকে ভাল করে একবার দেখল। অসাধারণ কিছুই নেই গোপালের মধ্যে। কালো, ছিপছিপে, লম্বাটে গড়ন। গায়ে এমন কিছু আহামরি জোর থাকার কথা নয়। মুখোনাও নিপাট ভালমানুষের মতোই। ষণ্ডাগুণ্ডা বলে মনে হয় না। তবে তার চোখ দুখানা বেশ তীক্ষ্ণ।

ক্লাস শুরু হওয়ার পর হরি লক্ষ করল, মাস্টারমশাইরাও কেন যেন গোপালকে এড়িয়ে যান। একমাত্র হেডস্যারের ভূগোল ক্লাস আর জাহ্নবীবাবুর অঙ্ক ক্লাস ছাড়া আর কোনও ক্লাসে কোনও মাস্টারমশাই গোপালকে কোনও. প্রশ্ন করলেন না।

হরি আর-একটা জিনিসও লক্ষ করল। এ ক্লাসের সব ছেলেই বেশ বড়-বড়। বেশির ভাগেরই বয়স পনেরো-ষোলোলা থেকে উনিশ কুড়ি। বোঝা যায় যে, এরা বহুবার গাড়ু

মেরে ক্লাস সেভেনে উঠেছে। গোপালেরও বয়স সতেরো-আঠারো হবে। দুই ক্লাসের ফাঁকে একবার সে গোপালকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি ভাই অনেকবার ফেল করেছ?"

গোপাল মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বলল, "না, তবে লেখাপড়া শুরু করতেই আমার অনেক দেরি হয়েছে।"

"কেন?"

সে অনেক কথা। তবে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম! অনেক দিন পালিয়ে-বেড়িয়ে থাকার ফলে পড়াশুনো হয়নি।"

"কেন পালিয়েছিলে?"

"বাড়িতে ভাল লাগে না। পৃথিবীটা কী বিশাল, আর বাড়িটা কত ছোট।"

আজ টিফিন পিরিয়ডে হরি আর গোপাল একসঙ্গে বেরোল। জামতলায় একজন চিনেবাদামওলা বসেছিল। তার কাছ থেকে দু'জনে বাদাম কিনে গাছের ছায়ায় বসে বসে গল্প করল। গোপাল নিজে বেশি কথা বলল না, বরং হরিকে প্রশ্ন করে করে তার বাড়ির কথা আর এখানে

আসার ইতিহাস সব জেনে নিল। হরি বলল, "ও, ভাল কথা, আমাদের বাড়িটার নাম কুসুমকুঞ্জ নয়, গ্রিন ভ্যালি।"

গোপাল হাসল; বলল, "জানি। কালই খোঁজ নিয়েছি। খুব ভাল আতা হয় ওবাড়িতে। ভাল জাতের ল্যাংড়া আমও ফলে। একবার আম চুরি করতে গিয়ে ওই জগুরামের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম।"

"বটে? তারপর কী হল?"

"জগুরাম কুস্তিগির ছিল, তা জানো?"

"না। তবে ওরকমই চেহারা। তোমাকে মারল নাকি?" গোপাল একটু হেসে বলল, "মারতেই চেয়েছিল। তবে পারেনি।"

"কেন পারেনি?"

"পাগলা-সাহেব এসে পড়ল যে!"

"পাগলা-সাহেব কে বলল তো? কালও একজন বলছিল, সে নাকি সাদা ঘোড়ায় চেপে একজন সাহেবকে যেতে দেখেছে।"

"ঠিকই দেখেছে।"

"পাগলা-সাহেব কি সত্যিই পাগল?"

"তা কে জানে! লোকে বলে পাগলা-সাহেব, আমরাও তাই বলি। তবে..."

"তবে কী?"

"পাগলা-সাহেবকে কিন্তু সবাই দেখতে পায় না। কেউ-কেউ পায়।"

"তার মানে কী?"

গোপাল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু টিফিন শেষ হওয়ার ঘন্টা বাজায় কথাটা আর এগোল না।

টিফিনের পরের ঘন্টাগুলোও আজ বেশ শান্তিতেই কেটে গেল। শুধু ইতিহাসের ক্লাসে আকবরের ছেলের নাম বলতে না পারায় হরিবন্ধুকে একটি মোলায়েম কানমলা খেতে হল। তা সেটা গায়ে না মাখলেও চলে। মারধোর তার কাছে কিছুই নয়।

ছুটির ঘন্টা বাজবার একটু আগে গোপাল বলল, "আজও তোমাকে একটু এগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নোয়াপাড়ার সঙ্গে আজ একটা কাবাডি ম্যাচ আছে।"

হরিবন্ধু লজ্জিত হয়ে বলে, "না না, এগিয়ে দিতে হবে না।"

আজ আর ছুটির পর হরিবন্ধু অপেক্ষা করল না। বইখাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। স্কুলের ফটক থেকেই গোপাল অন্য দিকে রওনা হয়ে যাওয়ার পর হরি একা, ছেলেদের দঙ্গল থেকে একটু তফাতে থেকে বাড়িমুখো হাঁটতে লাগল। হাঁটতে-হাঁটতে সে গোপালের কথাই ভাবছিল। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ক্লাসের সব ছেলেই গোপালকে ভয় পায়, কিন্তু কেন পায় সেটাই তাকে খুঁজে বের করতে হবে। মাস্টারমশাইরাও দেখা যাচ্ছে পারতপক্ষে গোপালকে ঘাঁটান না, তারই বা রহস্য কী? আর গোপাল তাকেই বা এমন করে আগলে রাখল কেন!

ছেলের দঙ্গল বিভিন্ন পথ ধরে যে-যার বাড়ির দিকে চলে গেল। রাস্তা নির্জন হয়ে এল। চৌপথি থেকে ডান হাতে বাঁক ঘুরতেই একটা নির্জন কালীবাড়ি। গতকালও লক্ষ করেছে হরি, চারদিকে মস্ত-মস্ত তেঁতুলগাছ। খুব ঝুপসি ছায়া আর নির্জনতার মধ্যে খুদে কালীবাড়িটা গাছপালার জন্য প্রায় নজরেই পড়ে না। কালী-দুগা শিব-কৃষ্ণ যা-ই হোক, ঠাকুর-দেবতার স্থান দেখলেই প্রণাম করা হরির স্বভাব। কাল ঠাহর পায়নি বলে প্রণামটা করা হয়নি। আজ ভক্তিভরে হাতজোড় করে চোখ বুজে ডবল প্রণাম ঠুকল সে মা-কালীকে, মাস্টারমশাইদের রাগ কমিয়ে দাও মা, বজ্জাত ছেলেগুলোর সুমতি দাও মা, গোপালের সঙ্গে যেন কখনও আড়ি না হয় মা, পাগলা-সাহেবের চাবুক যেন পিঠে না পড়ে মা, বাবার মনটা যেন নরম হয়ে যায় মা, আমি যেন বাড়ি ফিরে যেতে পারি মা... ইত্যাদি।

প্রণাম সেরে চোখ খুলতেই কিন্তু সে থতমত খেয়ে গেল। সামনে গোটা-চারেক হুমদো-হুঁমদো ছেলে দাঁড়িয়ে। তার ক্লাসেরই ছেলে। গোপাল এদেরই চিনিয়ে দিয়েছিল। গদাধর, অনিল, দীপঙ্কর আর রাজর্ষি।

গদাধরের চেহারা যেমন বিকট, গলার স্বরটাও পিলে চমকে দেওয়ার মতো বাজখাঁই। সে হরির থুতনিতে একটা ঠোনা মেরে সেই বাজ-ডাকা গলায় বলল, "গোপালের সঙ্গে ভাব করা হয়েছে চাঁদু? ভেবেছ পার পেয়ে যাবে? আমরা অত সোজা লোক নই হে। এখন বলো তো চাঁদু, গোপালকে কী ঘুষ দিয়ে হাত করেছ।"

ভয়ে সিঁটিয়ে গেল হরি। একটু আগে মা-কালীকে রীতিমত ভক্তির সঙ্গে ডাকাডাকি করেছে। তার এ কী পরিণাম? সে আমতা-আমতা করে বলল, "ঘুঘুষ কেন দেব? গোপালই তো বন্ধুত্ব পাতিয়েছে।"

"গোপাল বন্ধু পাতানোর ছেলে! ওকে চিনি না ভেবেছ? তা ঘুষটা ওকে না দিয়ে আমাদেরও তো দিলে পারতে। একটু ঘুষ-টুষ পেলে আমরা কি কম বন্ধুত্ব করতে জানি?"

কী জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না হরি।

গদাধরকে ঠেলে একদিকে সরিয়ে রাজর্ষি এগিয়ে এল। রাজপুত্রের মতো চেহারা। কিন্তু চোখ দুটোয় কেমন অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর দৃষ্টি। রক্ত হিম হয়ে যায়। সেই রক্ত-জল-করা চোখে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে সে বলল, "একটা কথার জবাব দেবে?"

"কী কথা?"

"গোপাল আমাদের কথা তোমাকে কী বলেছে?"

হরি মাথা নেড়ে বলল, "কিছু বলেনি।"

"তার মানে বলবে না?"

হরি ভয় খেয়ে বলল, "তেমন কিছু বলেনি।"

"কী বলেছে তা আমরা শুনতে চাই।"

হরি বিপন্ন গলায় বলল, "সেটা তোমরা কেন গোপালকেই জিজ্ঞেস করো না।"

"সেটা আমরা বুঝব। তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি জবাব দাও।"

হরিবন্ধু হঠাৎ সাহস করে বলে ফেলল, "তোমরা কি গোপালকে ভয় পাও?"

একথায় হঠাৎ চারজনই কেমন স্থির হয়ে গেল। তারপর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাকি করে নিল। রাজর্ষি বলল, "আমরা কাউকে ভয় পাই না। গোপালের সঙ্গে আমাদের বোঝাঁপড়া পরে হবে। এখন বলো, গোপাল তোমাকে কী বলেছে।"

চারজনের দ্বিধার ভাব দেখে হরিবন্ধুর আর সন্দেহ রইল না যে, মুখে যতই বারফাট্টাই করুক, এরা গোপালকে ভয় পায়। এটা বুঝতে পেরে তার বুকে যথেষ্ট সাহস এল। সে বুক চিতিয়ে বলল, "আমি বলব না।"

রাজর্ষি আর গদাধর এই জবাবে খুবই যেন অবাক হয়ে গেল। কেমন যেন দ্বিধার ভাবও তাদের হাবভাবে। রাজর্ষি বলল, "আমার সম্পর্কে তোমাকে ও কিছু বলেছে?"

"বলতে পারে।"

"কী বলেছে সেটা আমি জানতে চাই।"

"জেনে কী করবে? মারবে গোপালকে?"

"সেটা ভেবে দেখব।"

হরি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়িমুখো হাঁটা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তা হলে বাড়ি গিয়ে ভাবো গে যাও। কাল তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।"

আশ্চর্যের বিষয়, ছেলেগুলো তার পিছু নিল না বা শাসাল না, মারা তো দূরের কথা। একটু এগিয়ে গিয়ে একবার পিছু ফিরে তাকিয়ে হরি দেখল, তেঁতুলতলার ছায়ায় চারটে

ছেলে এখনও ভূতের মতো দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। গোপাল বলেছিল, ওই চারজনের তিনটে ডাকাত, একটা খুনে। হতেও পারে। তবে আপাতত চারজনের মাথাতেই যেন ধুলোপড়া পড়েছে।

হরি যখন বাড়ি ফিরল, তখন বেলা মরে এসেছে। সে ঘরে ঢুকতেই জগুরামের বউ ঝুমরি একটা কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে ঘরে দিয়ে গেল। হরি বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে আসতেই ঝুমরি মস্ত এক বাটিতে বিশাল এক তাল ছাতুমাখা নিয়ে এল।

ছাতু হরি কখনও খায়নি। দেখেই তার খিদে উবে গেল। সে বলল, "ওসব আমি খাই না। নিয়ে যাও।"

ঝুমরি বড় একটা কথা কয় না। এবারও কিছু বলল না। টেবিলের ওপর ছাতুর বাটির পাশে এক গ্লাস জল গড়িয়ে রেখে দিয়ে চলে গেল।

ছাতু দেখে যতই অনিচ্ছে হোক, পেটে তার সাজ্ঘাতিক খিদে। এখানকার জল-হাওয়া ভাল বলেই সে শুনেছে। তাই দোনোমোনো করে সে ছাতুর তাল থেকে একটু খুঁটে মুখে তুলল। মনে হচ্ছে আচারের তেল এবং আরও দু-একটা অদ্ভুত মশলা দিয়ে মাখা। টক, ঝাল, নোনতা স্বাদটাও বেশ ভাল। নিজের অজান্তেই আনমনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে হরি ছাতুর তাল থেকে ভেঙে-ভেঙে খেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর বাটিতে হাত দিয়ে সে অবাক হয়ে দেখল, ছাতুর তালটা আর নেই। বাটি একেবারে ভোঁভাঁ। ভারী অবাক হল সে। ইঁদুর বা ছুঁচো এসে নিয়ে যায়নি তো মুখে করে?

না। সে টের পেল ছাতুর তালটা উধাও হয়েছে বটে, কিন্তু পুরোটাই সেঁধিয়েছে তার পেটে। নিজের পেটের দিকে অবিশ্বাসভরে চেয়ে রইল হরি। যখন আর সন্দেহ রইল না, তখন ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিল।

বাইরে বেশ ঘুটঘুট্টি অন্ধকার জমে উঠেছে। পুরনো বাড়ির নানা জায়গা থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ আসছে। একটা আলগা পাল্লা মাঝে-মাঝে খটাস করে বন্ধ হচ্ছে, আবার ক্যাঁচক্যাঁচ করে খুলে যাচ্ছে। ধেড়ে ইঁদুর ডেকে উঠল যেন কোনও ঘরে। একটা বেড়াল মিউমিউ করে দোতলার কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাছেপিঠে কোথায় যেন শিয়াল ডেকে উঠল এক ঝাঁক।

এবাড়িতে একা ঘরে রাতটা কী করে সে কাটাবে? শুধু একটা রাতই তো নয়, রাতের পর রাত!

আবার পরমুহূর্তেই বাড়ির কথা ভেবে তার মনটা রা, আর অভিমানে ভরে গেল। একা এই নিবান্ধব পুরীতে তাকে নির্বাসনেই তো পাঠানো হয়েছে। সে মরুক বাঁচুক, তাতে কার কী আসে-যায়? ভাবতে ভাবতে তার চোখে জল চলে এল। গোবিন্দদার হাত দিয়ে সে মা'কে একটা চিঠি পাঠিয়েছে : 'আমি এখানে থাকলে বেশিদিন বাঁচব না, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবাকে বলো।

এখন তার চিঠিটার জন্য লজ্জা করতে লাগল। ওরকম চিঠি না লিখলেই পারত।

স্কুলে অনেক টাস্ক দিয়েছে। এই স্কুলে হোমটাস্ক জিনিসটা সাঙ্ঘাতিক। প্রত্যেকটা খাতা খুঁটিয়ে পড়া হয়, নম্বর দেওয়া হয়। টাস্ক না করলে লাঞ্ছনা-অপমানের একশেষ।

চোখের জল মুছে টেবিলের ওপর বইখাতা সাজিয়ে বসে গেল হরি। টাস্ক করতে করতে ভয়ের ভাবটাও কমে আসতে লাগল। মাঝে-মাঝে জানালা দিয়ে চেয়ে সে দরোয়ান জগুরামের ঘরে টেমির আলো দেখতে পাচ্ছিল। ঝুমরি বোধহয় রান্না করতে করতে একখানা গান ধরল। দেহাতি গান। অনেকটা কান্নার মতো বিষণ্ণ সুর। মাঝে-মাঝে আনমনে শুনতে পাচ্ছিল হরি।

রাত দশটা নাগাদ হরির হঠাৎ খেয়াল হল, কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। শরীরের মধ্যে যেন একটা ফাঁকা-ফাঁকা ভাব। পেনসিলটা দাঁতে কামড়ে ব্যাপারটা একটু বুঝবার

চেষ্টা করল হরি। খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর হঠাৎই ব্যাপারটা তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ফাঁকাই বটে, তার পেটটাই বিলকুল ফাঁকা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিকেলে যে। প্রকাণ্ড ছাতুর তালটা সে আনমনে খেয়ে নিয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে পেট থেকে। মোতিগঞ্জের জল-হাওয়া বোধহয় খুবই ভাল।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, খিদেটা চাগাড় দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল ঝুমরি। হাতে থালা। থালার ওপর গরম ধোঁয়ানো ভাতের একটা পাহাড়। সঙ্গে অড়হরের ডাল, তরকারি।

ভাতের পরিমাণ দেখে আঁতকে উঠে হরি বলল, “অত আমি খেতে পারব না। কমিয়ে আনো।”

ঝুমরি কথাটা গায়েই মাখল না। থালা রেখে জল গড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

অগত্যা হরি খেতে বসল। আশ্চর্যের বিষয়, পাহাড়টা অর্ধেক তার পেটে সেঁধিয়ে যাওয়ার পরও পেটটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকাই লাগছিল হরির। একা-একা বসেও এত ভাত খেতে হরির একটু লজ্জা লাগতে লাগল।

পুরো পাহাড়টা শেষ করে যখন উঠল হরি, তখন নিজের খাওয়ার বহর দেখে সে নিজেও অবাক হয়ে গেল।

৪. রাত্রিবেলা একা ঘরে শুতে

রাত্রিবেলা একা ঘরে শুতে একটু ভয় ভয় করছিল হরির। জীবনে সে কখনও একা ঘরে শোয়নি, একখানা গোটা বাড়িতে একা শোওয়া তো দুরস্থান। তার ওপর সাহেবপাড়ার মতো নির্জন জায়গায়।

কিন্তু উপায়ই বা কী? হ্যারিকেনের সলতে কমিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে সে নিঃসাড়ে শুয়ে নিজের বুকের ঢিবঢিবিনি শুনল কিছুক্ষণ। ইঁদুরের শব্দ, বাতাসের শব্দ, শেয়াল বা বেড়ালের ডাক, সবই তার চেনা। ঝিঁঝির ডাকও সে কতই শুনেছে। তবু এই অচেনা নির্জন জায়গায় সব কটা শব্দই তার ভুতুড়ে বলে মনে হচ্ছিল। ঘুম আসছিল না।

তবে পেটে ছাতু ও ভাতের যে দুটি পাহাড় ঢুকেছে, তার প্রভাবে এবং লেপের ওমের ভিতরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পরেই নিজের অজান্তে তার ঘুম এসে গেল।

ঘুমটা ভাঙল মাঝরাতে। কী একটা অনির্দেশ্য অস্বস্তি, মনের মধ্যে একটা সুড়সুড়ি, একটা রহস্যময় কিছু ঘুমের মধ্যেও টের পেয়ে আচমকা সে চোখ মেলল। মেলেই সে পট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শিয়রের জানালার দিকে।

জানালার বাইরে ফিকে অন্ধকার, একটা ঝুপসি গাছ। বন্ধ কাঁচের শার্সির গায়ে একটা ছায়া কি? অনেকটা মানুষের আকৃতির মতো? চোখটা দুহাতে রগড়ে নিয়ে আবার চাইল হরি। কোনও ভুল নেই। একটা লোক শার্সির ওপাশ থেকে চেয়ে আছে ঘরের মধ্যে।

হরি কিছু না ভেবে-চিন্তেই বালিশের পাশ থেকে টর্চ আর পাশে শোয়ানো লাঠিটা নিয়ে লাফিয়ে উঠে "কে, কে, কে ওখানে" বলে বিকট চেঁচিয়ে উঠল।

ছায়াটা টক করে সরে গেল।

হরি দৌড়ে গিয়ে জানালা খুলে চেঁচিয়ে উঠল, "ও জগুরাম? জগুরা- আ ম।"

দারোয়ানের ঘর তার ঘর থেকে দেখা যায়। জগুরামের ঘরে একটা টেমি উশকে উঠল। দরজা খোলার শব্দ হল। জগুরাম বেরিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কাছে এসে বলল, "ক্যা হুয়া?"

উত্তেজিতভাবে হরি বলে উঠল, "আমার জানালায় একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল।"

জগুরাম খুবই উদাস মুখে বলল, "তো ক্যা হুয়া? চোর-ডাকু কোই হোগা। শো যাও।"

লোকটার এরকম উদাসীনতা দেখে হরি ভারী রেগে গেল। বলল, "চোর এসেছিল শুনেও তুমি গা করছ না?"

এর জবাবে জগুরাম যা বলল, তার তুলনা নেই। সে হিন্দিতে বলল, "দুনিয়াটাই চোরচোট্টায় ভরে গেছে। তারা আর যাবেই বা কোথায়? আর রাতে ছাড়া তাদের কাজের সুবিধেও হয় না কিনা! এখানে চোর-ডাকাত মেলাই আছে। ওসব নিয়ে ভাবলে মোতিগঞ্জে থাকাই যেত না।"

জগুরাম চলে যাওয়ার পর হরি আর ঘুমোতে পারল না। ঘড়িতে দেখল রাত সাড়ে তিনটে। হ্যারিকেনের আলো বাড়িয়ে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ভাবল, এখানে যদি থাকতেই হয় তা হলে ভয়ডর ঝেড়ে ফেলতে হবে। চোর-ডাকাত যে-ই এসে থাকুক, সে ভয় পেয়েছে জানলে ফের আসবে।

হরি টর্চ আর লাঠি নিয়ে উঠল। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। টর্চ জ্বেলে জানালার নীচের মাটি প্রথমে পরীক্ষা করল হরি।

পায়ের ছাপ ভাল বোঝা গেল না বটে, তবে কয়েকটা পাতাবাহারের গাছ ভেঙে থেতলে গেছে।

ছায়ামূর্তিটা ডান দিকে সরে গিয়েছিল। সুতরাং হরি টর্চ নিবিয়ে সেদিকেই সন্তর্পণে এগোল। শেষ রাতে ফিকে একটু জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে। কুয়াশায় মাখা সেই জ্যোৎস্নায় চারদিকটা ভারী ভুতুড়ে আর অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এ যেন মানুষের রাজ্য নয়, কোনও রূপকথার জগৎ।

বাগানের এপাশটায় অনেক ঝুপসি গাছপালা। তার ছায়ায় গাঢ় অন্ধকারে মৃদু জ্যোৎস্নার ইকড়ি-মিকড়ি। হরি চারদিকে চেয়ে পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল বাগানের পাঁচিলটা এক জায়গায় ভাঙা। আর সেই ভাঙা জায়গাটায় একটা লোক যেন গুঁড়ি মেরে বসে আছে।

হরি গাছের ছায়ায় ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে এগোতে লাগল। তার যে ভয় না করছিল এমন নয়। কিন্তু আজ রাতে সে ভয় নিকেশ করতে বদ্ধপরিকর। মোতিগঞ্জে টিকে থাকতে গেলে বুকের পাটা চাই।

লোকটাও অদ্ভুত। ভাঙা পাঁচিলটায় উঠে স্থির হয়ে বসে আছে। খুব মনোযোগ দিয়ে সামনের দিকে কিছু দেখছে বোধহয়! হরির দিকে তার পিঠ।

লোকটার কাছে গিয়ে হরি হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে চাপা গলায় বলল, “একটু নড়েছ কি মাথা ফাটিয়ে দেব। চুপচাপ সুড়সুড় করে ভাল ছেলের মতো নেমে এসো।”

লোকটা খুব আস্তে ঘাড় ঘোরাল। তাকে খুবই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে মুখে আঙুল তুলে ফিসফিস করে বলল, “চুপ। শব্দ করলেই বিপদ।”

হরি লাঠিটা উঁচিয়ে বলল, “আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে? একটু আগেই

তুমি আমার জানালায় উঁকি মেরেছিলে? চোর কোথাকার।”

লোকটাও খ্যাঁক করে উঠল, “হুঁ, জানালায় উঁকি মারলেই বুঝি চোর হয়ে যায় লোকে! বেশ কথা তো! উঁকি দিয়েছি তো কী হয়েছে, কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়েছে তাতে?”

হরি অবাক হয়ে বলল, “তাই বলে মাঝরাত্তিরে উঁকি দেবে?”

“ওঃ, খুব পাপ হয়েছে বুঝি? পাড়ায় নতুন কে লোক এল তাই দেখতে একটু উঁকি দিয়েছি, আর অমনি বাবা কী চিল-চ্যাঁচানি! যেন ওঁর সর্বস্ব নিয়ে ভেঙ্গে পড়েছি। নেওয়ার তোমার আছেটাই বা কী হে ছোঁকরা? একটা টিনের তোরঙ্গ আর গুচ্ছের বইখাতা। ছ্যাঃ, ওসব ছোঁবে কোন্ চোরে?”

“তা হলে তুমি চোর নও?”

লোকটা এবার একটু নরম গলায় বলল, “চোর হতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার প্যালারাম রেলে চাকরি পেয়ে গেছে না? এখন আর কে চুরি করে? বুড়ো বয়সে ওসব কি আর পোয়? তবে যদি সত্যিই চুরি করার মতলব থাকত, তবে কি আর তোমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙত হে ছোঁকরা? এই পটল দাসের এলেম তো জানো না, তোমার তলা থেকে বালিশ বিছানা অবধি সরিয়ে ফেলতুম, তুমি টেরটিও পেতে না।”

বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোট্টা চেহারার বয়স্ক লোকটিকে এবার একটু ভাল করে দেখল হরি। মুখে কাঁচাপাকা একটু দাড়ি আর গোঁফ আছে। মাথায় একটা পুরনো উলের টুপি। গায়ে একখানা খাকি রঙের ছেঁড়া সোয়েটার। পরনে ধুতি। পায়ে কেস আর মোজা। চোখে ধূর্ত দৃষ্টি। হরি টর্চটা নিবিয়ে ফেলে বলল, “তা হলে তুমি চোর ছিলে?”

“ছিলুম তো ছিলুম। অত খতেন কিসের? চোর হলেও আজকালকার ছোঁকরা-চোরদের মতো গবেটচন্দ্র ছিলুম না। চরণ, ছিদাম, দুখে, এদের জিজ্ঞেস করে দেখো, পটল দাসের নাম শুনলেই জোড়হাত করে কপালে ঠেকাবে। চোর কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু এলেম দেখালে সব কাজেই ইজ্জত আছে। তবে এই হালের ছোঁড়ারা মানতে চায় না। তা না মানুক।”

হরি লাঠিটা নামাল, লোকটাকে ভয়ের কিছু নেই। তবু মুখে বলল, “জগুরামকে ডাকলে এক্ষুনি তোমাকে ধরে পুলিশে দেবে।”

“কোন্ আইনে? চুরি করতে গিয়ে তো ধরা পড়িনি হে। তার ওপর পুলিশ কি হাতের মোয়া যে ডাকলেই পাবে? এখান থেকে থানা মাইলটাক দূরে। দারোগাবাবু কনেস্টবলবাবারা এ-সময়ে ঘুমোন, ডাকলে ভারী রেগে যান।”

হরি হেসে ফেলল। তারপর বলল, “তা তুমি ওই ভাঙা পাঁচিলে উঠে কী করছ? নেমে এসো। আজ তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।”

“ছাড়তে হবে না। আমি তো ধরাও পড়িনি এখনও। ছাড়বার তুমি কে। হে? ভাবছিলাম ভদ্রবাবুদের বাড়িটা এই ফাঁকে একটু দেখে যাব। দিনে কালে এবাড়ি থেকে কত কী সরিয়েছি। কিন্তু ঢুকতে ঠিক সাহস হচ্ছে না। কী যেন একটা দেখলাম। ভাল করে দেখার জন্য ঘাপটি মেরে বসে আছি তখন থেকে।”

“কী দেখেছ?”

“কী দেখেছি সেইটেই তো ঠিক বুঝতে পারছি না। সেই আগের চোখও নেই। বাঁ চোখটায় ছানি এসেছে। প্যালারাম অবশ্য বলেছে শহরে নিয়ে গিয়ে চোখ কাটিয়ে আনবে। তখন সব আবার আগের মতো দেখতে পাব।”

হরি ধৈর্য হারিয়ে বলল, “কিন্তু কী দেখলে সেটা বলবে তো?”

“দেখলুম যেন ওই গোলাপ-ঝোঁপটার কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। মতলব নিশ্চয়ই ভাল ছিল না। দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছিল বাড়িটার দিকে চেয়ে। এমন সময় আর-একটা লোক যেন মাটি খুঁড়ে লোকটার পিছন দিকে উদয় হল। তারপর প্রথম লোকটার মাথায় একটা ইট তুলে দড়াম করে বসিয়ে দিল। লোকটা একটাও শব্দ করতে পারেনি। কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল। তখন দ্বিতীয় লোকটা তার পা ধরে হেঁচড়ে নিয়ে

গোলাপ-ঝোপে লাশটা ঢুকিয়ে দিয়ে কোথায় হাওয়া হল। বুড়ো বয়সে এখন ঠিক আর এগিয়ে যেতে সাহস পেলুম না। খুন যদি হয়ে থাকে তবে সাক্ষী থাকাটাও বিপদের কথা।”

হরি উত্তেজিত হয়ে বলল, “ও বাড়িতে কে থাকে?”

“কেউ না। বুড়ো অবিনাশ ভদ্র ছিল। তা সেও গতবারে মরে গেল। ওয়ারিশও কেউ নেই। বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে।”

“দরোয়ান?”

“নাঃ। দরোয়ানের মাইনে দেবে কে? বললুম না ওয়ারিশই নেই।”

হরি বলল, “কিন্তু আমাদের তো ব্যাপারটা দেখা উচিত।”

পটল দাস মাথা নেড়ে বলল, “ওরে না রে বাবা, না। হুট করে কিছু করে বসতে নেই। তার ওপর আমার ছানিপড়া চোখে কী দেখতে কী দেখেছি তারই ঠিক কী? এই তো সেদিন দেখলুম পুকুরের ধারে দিব্যি এক রামধনু উঠেছে। নাতিকে ডেকে দেখাতে গেলুম, তা সে বলল, রামধনুটনু কিছুই নাকি নেই। আমি ভুল দেখেছি।”

“ভুল দেখেছ কি না সেটাও তো দেখা দরকার।”

পটল দাস মাথা নেড়ে বলল, “ন্যায্য কথা। কিন্তু ভয়টাও সেখানেই। যদি ভুল না দেখে থাকি, তবে লাশের কাছে যাওয়াটা উচিত নয়।”

“কিন্তু লোকটা তো না-ও মরে গিয়ে থাকতে পারে।”

“তা বটে।”

“এখনও তুলে নিয়ে মুখে জলটল দিলে বেঁচে যাবে হয়তো। কিন্তু সারা রাত হিমের মধ্যে পড়ে থাকলে মরেই যাবে।”

"সেও ঠিক কথা। কিন্তু আমার কেমন যেন সাহস হচ্ছে না।"

হরি এবার একটু গরম হয়ে বলল, "যখন চুরি করে বেড়াও, তখন ভয় করে না? এখন ভয় করলে চলবে কেন?"

পটল দাস এবার চোখ পাকিয়ে বলল, "চুরি মানে কেবল চুরিই? সেটা কি আর্ট নয়? আর আমাকে ছিচকে চোর পেয়েছ? পটল দাস কখনও ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না, মনে রেখো।"

"আমি কালই রটিয়ে দেব যে, তুমি চুরি করতে এসে আমার কাছে ধরা পড়ে গেছ।"

একথায় পটলের চোখ কপালে উঠল। বলল, "ও বাবা, তুমি যে বেশ পাজি তোক দেখছি। পটল দাস এখনও ধরা পড়েনি জীবনে, তা জানো? কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।"

"খুব করবে। এক্ষুনি তোমাকে জাপটে ধরে 'চোর, চোর' বলে চেঁচালে জগুরাম আর তার বউ দৌড়ে আসবে। তারপর ঘরে পুরে তালা দিয়ে রাখব। সকালে সবাই এসে দেখবে।"

একথায় পটল দাস খকখক করে হায়েনার হাসি হাসল। তারপর বলল, "জাপটে ধরবে? বটে! তা ধরার চেষ্টা করে দ্যাখো তো কী হয়।"

"কেন, মারবে নাকি? আমার গায়ে মেলা জোর তা জানো? পড়াশুনোয় তেমন ভাল না হতে পারি, কিন্তু গায়ের জোরে কম নই।"

"থাক, অত বড়াই করতে হবে না। তোমার চেয়ে ঢের-ঢের জোয়ান পালোয়ান দেখেছি। পটল দাসের বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু বিদ্যে তো মরেনি। এখনও অনেক ভোজবাজি দেখাতে পারি। দেখি না কেমন জাপটে ধরে রাখতে পারো। এসো দিকি পালোয়ানচন্দর।"

হরি এই ছোটখাটো বুড়োসুড়ো লোকটার কথা শুনে না-হেসে পারল না। একে ধরা নাকি আবার একটা ব্যাপার? সে চোখের পলকে দু হাতে জাপটে ধরল পটল দাসকে।

ধরল বটে, কিন্তু ভারী অবাক হয়ে দেখল, পটল দাসের বদলে সে ধরেছে খানিক হাওয়া বাতাসকেই। পটল তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে ফিকফিক করে হাসছে। হরি ব্যাঙের মতো একখানা লাফ দিয়ে গিয়ে একেবারে ঘাড়ের ওপর পড়ল পটলের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পটলও হুবহু ওরকমই একখানা লাফ মারল সঙ্গে-সঙ্গে, এবং ভোজবাজির মতো চার হাত তফাত হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে।

হরি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "তুমি ভূত নও তো?"

পটল দাস ফিক করে হেসে বলল, "তা ভূতও বলতে পারো। ভূত মানে অতীত। আমার কি আর সেই দিনকাল আছে? বেঁচে থেকেও মরা। তা হলে বুঝলে তো আমাকে ধরা অত সহজ নয়?"

হরি বোকার মতো মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি। যদি সত্যিই ভূত না হয়ে থাকো, তবে বলতেই হয়, তুমি বেশ ওস্তাদ লোক।"

পটল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এ আর কী দেখছ? আরও কত কী শিখেছিলাম। হস্তলাঘব, মুখবন্ধন, বায়ু-নিয়ন্ত্রণ, কুম্ভক। কোথাও কাজে লাগল না। প্যালারামকে শেখানোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ওর মায়ের জন্যই হল না। সে বলল, না, ছেলে তোমার মতো চোর হবে না।"

"আমাকে শেখাবে?"

"তুমি? তুমি শিখে কী করবে?"

"চুরি করব না। তবে শিখে রাখব।"

"শেখাতে পারি, তবে শর্ত আছে।"

"কী শর্ত?"

পটল বেশ লজ্জার সঙ্গে ঘাড় চুলকে বলল, "লেখাপড়া শিখিনি বলে আমাকে বড় হেনস্থা করে লোকে। ছেলেবউও বড্ড গঞ্জনা দেয়। তা আমার বড় ইচ্ছে, লেখাপড়া শিখে ওদের জব্দ করি। শেখাবে?"

"শেখাব।"

কথাবার্তায় হঠাৎ বাধা পড়ল। ভদ্রবাবুদের বাগান থেকে হঠাৎ একটা ক্ষীণ আর্তনাদের শব্দ এল।

দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে শুনল। তারপর পটল বলল, "পালাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো গে। আমিও এই বেলা সরে পড়ি।"

"কিন্তু পটলদা, ব্যাপারটা না দেখে পালানোটা কি ঠিক হবে?"

"ওঃ, তুমি জ্বালালে দেখছি। আচ্ছা, চলো। বেগতিক দেখলে আমি কিন্তু সরে পড়ব।"

দেওয়ালটা দু'জনে ডিঙোল। আগে পটল, পিছনে হরি।

পটল সাবধান করে দিয়ে বলল, "খবরদার, টর্চ জ্বেলোনা। টর্চ খুব খারাপ জিনিস। আমার পিছু-পিছু এসো। চোখে ছানি হলে কী হয়, অন্ধকারেও সব ঠাহর করতে পারি।"

ঘাসজমি ডিঙিয়ে ঝোঁপটার কাছে পৌঁছে পটল বলল, "এইখানে।"

বেশি খুঁজতে হল না। গোলাপ-ঝোঁপের ভিতর থেকে দু'খানি পা বেরিয়েই ছিল। পটল আর হরি টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল লোকটাকে। জ্যোৎস্নার ফিকে আলোতেও হরি মুখোনা চিনতে পেরে আর্তনাদ করে উঠল, "সর্বনাশ।"

পটল পট করে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, "আস্তে। চেঁচালে বিপদে পড়বে। তা লোকটা কে?"

"ও হল গোপাল। আমরা এক ক্লাসে পড়ি।"

পটল ভ্রূ কুঁচকে বলল, "এত অল্প আলোয় ঠিক চিনতে পারছি না। কোন্ গোপাল বলো তো। সেই ঝিকু সর্দারের ছেলেটা নাকি?"

"আমি ঝিকু সর্দারকে চিনি না। তবে গোপালকে সবাই ভয় পায়।"

পটলের ভ্রু সটান হয়ে গেল, "তা হলে ঠিকই ধরেছি। ঝিকুরই ছেলে। তা বেঁচে আছে নাকি?"

গোপাল বেঁচেই ছিল। তবে জ্ঞান নেই। মাথার পিছন দিকটা থেঁতলে গিয়ে রক্তে একেবারে ভাসাভাসি কাণ্ড। মাঝে বোধহয় জ্ঞান একটু ফিরেছিল। তখনই ককিয়ে উঠেছিল যন্ত্রণায়।

হরি সভয়ে বলল, "এখন কী হবে পটলদা?"

পটল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঝিকুর ছেলের গায়ে হাত তোলা

যার-তার কর্ম নয়। একটু আগেই বলছিলে না, সবাই ওকে ভয় পায়। তা ভয় ওকে সাধে পায় না। তবে ওকে নয়, ভয় ওর বাপকে। এখন এই কাণ্ডের পর ঝিকু ক'টা লাশ নামায়, দ্যাখো। দশ বছর আগে হলে ঝিকুর হাতে বিশ-পঞ্চাশটা খুন হয়ে যেত। এখন অত হবে না। কিন্তু কত হবে তা এখনই বলতে পারছি না। আমি বলি কি, এইবেলা পালাও।"

"কিন্তু এ যে আমার বন্ধু।"

"তা বটে, কিন্তু ঝিকু..."। "তখন থেকে কেবল ঝিকু-ঝিকু করছ কেন? ঝিকুটা কে?"

"এ-তল্লাটে যখন এসে পড়েছ তখন চিনবেই একদিন। আমি পাপমুখে সব বলি কেন? বন্ধুকে যদি ফেলে যেতে না চাও, তবে চলো ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে তোমার ঘরেই তুলি।"

তাই হল। দু'জনে ধরাধরি করে গোপালকে নিয়ে ভাঙা পাঁচিল পেরিয়ে হরির ঘরে এনে তুলল।

হরি বলল, "কিন্তু রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে। একজন ডাক্তার ডাকলে হয়? এত হেমারেজ হলে তো মরে যাবে। রক্তটা এখনও ক্লট বাঁধেনি। হেমাটোমো..."

পটল চোখ বড় বড় করে হরির কথা শুনছিল। হঠাৎ বলল, "তুমি কি ডাক্তারের ছেলে?"

"কী করে বুঝলে?"

"অনেক জানো দেখছি। তবে ভয় নেই। আমাকে সবসময়ে ওষুধ-বিষুধও রাখতে হয়। তবে টোটকা।"

বলেই পটল পোশাকের ভিতরে কোথায় হাত ভরে একটা শিশি বের করে আনল। তাতে খানিকটা কালচে তেল। যত্ন করে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল। আর-একটা শিশি বের করে হরির হাতে দিয়ে বলল, "খুব যন্ত্রণা হলে ছিপিটা খুলে একটু শুকিয়ে দিও। ওতেই কাজ হবে।"

হরি ডাক্তারের ছেলে বলেই তার সঙ্গে তুলো ব্যাণ্ডেজ ওষুধ থাকে। গোপালের মাথা ব্যান্ডেজে নিপুণ হাতে বেঁধে সে শিশিটা নিয়ে ছিপি খুলে একটু শুকে দেখল। চন্দন, গোলাপের আতর এবং আরও কিছু সুবাস-মেশানো একটা মাদক গন্ধ। সে অবাক হয়ে বলল, "এ তো স্মেলিং সল্ট নয়! তবে এটা কী?"

পটল মাথা নেড়ে বলল, “ডাক্তারি ওষুধ ছাড়াও দুনিয়ায় মেলা ওষুধ আছে। ওসব গুপ্তবিদ্যের খবর ডাক্তাররা জানেও না। এ হল কালী কবরেজের মুষ্টিযোগ। ওর নাকে একটু ধরেই দেখ না, কী হয়।”

আশ্চর্যের বিষয়,শিশির মুখটা গোপালের নাকের কাছে ধরার কিছুক্ষণ পরেই ধীরে-ধীরে গোপাল চোখ মেলে চাইল। দৃষ্টিটা ঘোলাটে, অস্বচ্ছ। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর চোখ স্বাভাবিক হয়ে এল। উদভ্রান্তের মতো সে চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে ক্ষীণ গলায় বলে উঠল, “ওরা পাগলা-সাহেবের কবর খুঁজছে।”

হরি গোপালের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, “কারা? কী খুঁজছে?”

পটল দাস চাপা গলায় বলে উঠল, “সর্বনাশ!”

গোপাল একবার উঠে বসবার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণে সে সাঙ্ঘাতিক দুর্বল। তার ওপর মাথায় চোটটাও বেশ জোরালো রকমের। উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ফের লুটিয়ে পড়ল বিছানায়।

হরি আবার তাকে শিশি শোঁকাতে যাচ্ছিল। পটল তার হাতটা ধরে বাধা দিয়ে বলল, “থাক। এখন ওকে ঘুমোতে দাও।”

হরি জিজ্ঞেস করল, “গোপাল কী সব বলল বলো তো! পাগলা-সাহেবের কবর না কী যেন!”

পটল খুব অবাক হয়ে বলল, “কই, আমি তো কিছু শুনতে পেলুম না! আমার কান সেই কখন থেকে ভোঁ-ভোঁ করছে, পরশু কানে একটা শ্যামাপোকা ঢুকেছিল তো!”

“কিন্তু এতক্ষণ তো আমার কথা দিব্যি শুনতে পাচ্ছিলে!”

"তা বটে। কিন্তু পোকাটা এই একটু আগে কানের মধ্যে নড়াচড়া শুরু করেছে। উরে বাবা, যাই, কানে একটু গরম তেল দিই গে।"

পটল দাস যে কিছু একটা চেপে যেতে চাইছে তা বুঝতে কষ্ট হল না হরির। তবে এই অবস্থায় সে আর এ-নিয়ে কথা বাড়াতে চাইল না। শুধু বুঝল, কেউ বা কারা পাগলা সাহেবের কবর খুঁজছে, এই হল মোদ্দা কথা। এটা খুব একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার বলেও তার মনে হল না। সে পটল দাসের দিকে চেয়ে বলল, "আমাকে পাঁচ শেখাবে বলেছিলে, মনে আছে তো! তার বদলে আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাব।"

পটল ঘাড় কাত করে বলল, "খুব মনে আছে। তবে দিনের বেলা আমার সুবিধে হবে না। রাতবিরেতে চলে আসব'খন। ভোর হয়ে আসছে, এবার গিয়ে আমাকে গর্তে ঢুকে পড়তে হবে। আসি গে।"

"এসো। এর বাড়িতে একটা খবর দিও।" পটল দাস রাজি হয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

হরি ঠায় বসে রইল গোপালের পাশে।তারপর একসময়ে ঢুলুনি এসে গেল তার। চোখ বুজে ফেলল। তারপর আর কিছু মনে রইল না।

৫. চোখে রোদ লাগায়

চোখে রোদ লাগায় ধড়মড় করে উঠে নড়েচড়ে বসল হরি। তারপর অবাক হয়ে দেখল, বিছানাটা খালি। গোপালের চিহ্নও নেই। তবে বালিশে রক্তের দাগ লেগে আছে। টেবিলের ওপর গোপাল দাসের দুটো ওষুধের শিশি পাশাপাশি ভাইবোনের মতো দাঁড়িয়ে।

তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমটা দেখল হরি। নেই। বারান্দা এবং আশেপাশে বাগানেও খুঁজল। নেই। কিন্তু ওই অবস্থায় গোপালের পক্ষে খুব বেশি দূরেও তো যাওয়া সম্ভব নয়।

দরোয়ান জগুরাম বাড়িতে ছিল না। ঝুমরি ছিল। রোদে ছোট একটা খাঁটিয়ায় একটা বাচ্চাকে শুইয়ে তেল মাখাচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করায় কিছুক্ষণ বোবার মতো চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, সে কাউকে দেখেনি।

রাস্তাটাও একটু ঘুরে দেখে এল হরিবন্ধু। কেউ কোথাও নেই।

ঘরে এসে চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ স্থির মস্তিষ্কে ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখল সে। কিন্তু সমাধান ভেবে পেল না।

স্কুলের সময় হয়ে এসেছিল বলে অগত্যা উঠতে হল হরিবন্ধুকে। খুবই অন্যমনস্ক ভাবে সে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে স্নান করল। তেমনি আনমনেই ঝুমরির বেড়ে-আনা এক-পাহাড় ভাত খেয়ে নিল। কিন্তু সারাক্ষণ সে ভাবতে লাগল, কাল রাতে সে কি স্বপ্ন দেখেছিল? যদি স্বপ্ন

হয়ে থাকে তবে গোপালকে কারা এবং কেন মারল? পাগলা-সাহেব বলে একজন কেউ এখানে আছে, যার কথা গোবিন্দদা তাকে বলেছে, গোপালও বলেছে, তবে তার আবার কবর কী করে থাকবে! আর সেই কবর খুঁজছেই বা কারা! পটল দাস লোকটা আসলে কে!

ভাবতে ভাবতে পোশাক পরে বইখাতা নিয়ে সে সাহেবপাড়ার নির্জন রাস্তা দিয়ে স্কুলের দিকে হাঁটতে লাগল। পাশের বাড়ির দিকে অনিবার্যভাবেই তার চোখ চলে গেল। কাল রাতের ঘটনাস্থল। দিনের বেলা ভাল করে দেখল হরি। একসময়ে বিশাল ফুলের বাগান ছিল, পাথরের ফোয়ারা ছিল, পরী ছিল। এখন বাগান জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। পরীর দুটো ডানাই ভাঙা। ফোয়ারা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। বাড়িটাও বিশাল। কিন্তু নোনা ধরে, শ্যাওলা পড়ে, অশ্বত্থগাছ গজিয়ে বাড়িটার বারোটা বেজে যাচ্ছে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল হরি। দেখতে দেখতে হঠাৎ ফটকের গায়ে শ্বেতপাথরে খোদাই করা নামের ফলকটা চোখে পড়ল তার। সাদার ওপর কালো অক্ষরে লেখা, 'কুসুমকুঞ্জ' ।

হরি একটু শিউরে উঠল। গোপাল তাকে কুসুমকৃঞ্জের কথা বলেছিল বটে।

সে আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি স্কুলের দিকে হাঁটা দিল। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

স্কুলে এসে দেখল, গোপালের জায়গাটা ফাঁকা, ফাঁকাই থাকার কথা। তবু মনটা খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটা যে কোথায় গায়েব হল, কে জানে! যারা রাতে গোপালকে মেরেছিল তারাই গুম করে নিয়ে যায়নি তো! আজ ক্লাসে রাজর্ষি বা থ্রি মাস্কেটিয়ার্সকে দেখতে পাওয়া গেল না। তাতে একটু স্বস্তিই বোধ করল হরি।

ফার্স্ট পিরিয়ড শুরু হওয়ার মুখে শেষ বেঞ্চের একটা ছেলে হঠাৎ এসে তার হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেল। হরি কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখল, তাতে লেখা: তুমি যে কাল রাতে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ সেকথা আমি ভুলব না। আমি এখন ভাল আছি। তবে কয়েক দিন স্কুলে যাওয়া হবে না। সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন তুমি ঘুমোচ্ছিলে। আমি তোমাকে ডাকিনি। পাছে আমাকে নিয়ে তুমি ঝামেলায় পড়ো সেই ভয়ে চলে এসেছি। চিন্তা কোরো না। একটা ইটের ঘায়ে কাবু হওয়ার ছেলে গোপাল নয়। দেখা হলে সব বলব। একটা কথা বলে রাখি, কুসুমকুঞ্জের ভিতরে ভুলেও যেও না। তোমার ভালর জন্যই বলছি।

চিঠিটা ভাঁজ করে অঙ্ক বইয়ের মধ্যে রেখে একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলল হরি। গোপালের জন্য তবে চিন্তার তেমন কিছু নেই।

আজও ক্লাসে কেউ তাকে বিন্দুমাত্র বিরক্ত করছিল না। কিন্তু সারাক্ষণই হরি খুব অস্বস্তির সঙ্গে টের পাচ্ছিল, অলক্ষ্যে কে যেন তার দিকে বিষদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে সে সকলের চোখের দিকে চেয়ে দেখছিল। কিন্তু কে যে অমনভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে, তা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তাকানোটা এমনই মারাত্মক যে, আঙুলের স্পর্শের মতো টের পাচ্ছিল সে।

ভালয়-মন্দয় ক্লাসগুলো কেটে গেল। স্কুল থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে মোড় নিতেই মস্ত শিমুলগাছটার আড়াল থেকে একটা ছেলে বেরিয়ে এসে বলল, "আমি টুলু। গোপাল আমার বন্ধু।"

ছেলেটাকে হরিও চিনল। গোপালের চিঠিটা ওই এনে দিয়েছে তাকে। রোগা, ফর্সা চেহারা। দেখলে মনে হয় নিতান্তই নিরীহ।

হরি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল, "গোপাল এখন কেমন আছে?"

টুবলু ঠোঁট উলটে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, "গোপাল কত মার খেয়েছে, ওর কিছু হয় না ওতে। দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।"

"তুমি কি ওর বাড়ির কাছে থাকো?"

"হ্যাঁ। আমাদের পাশাপাশি বাড়ি। শোনো, আমি কিন্তু গোপালের মতো সাহসী নই। গোপাল আমাকে বলেছে, যেন তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, বিপদ-টিপদ হলেই আমি পালাব।"

হরি মৃদু হেসে বলল, "আমাকে পৌঁছে দেওয়ার কোনও দরকার নেই তোমার। বিপদ কিছু হবে না। আর হলেও আমি অত ভয় পাই না। তুমি বাড়ি যাও।"

"পাগল! গোপাল তা হলে কি আমাকে আস্ত রাখবে? তোমাকে বাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি।"

হরি বুঝল, গোপালের আদেশ এ-ছেলেটার কাছে গুরুর আদেশের মতো। সেই আদেশ পালন না করে ওর উপায় নেই।

হরি হেসে বলল, "চলো তা হলে, গল্প করতে করতে যাই।"

দু'জনে গল্প করতে করতে হাঁটতে লাগল। বেশির ভাগই স্কুলের কথা, ছেলেদের কথা, নিজেদের কথা।

তেঁতুলতলার কালীবাড়ি ছাড়িয়ে বাঁ দিকে সাহেবপাড়ার মোড়ের কাছবরাবর ইউক্যালিপটাস আর শালগাছে ভরা এক টুকরো জমি আছে। শীতের অপরাহ্নে সেখানে গাঢ় ছায়া জমে আছে। সেই জমিটার পাশ দিয়ে যখন দু'জনে যাচ্ছে তখন আচমকা সাত-আটটা ছেলে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের ঘিরে ফেলল চোখের পলকে। আর তারা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই টানতে টানতে জঙ্গলটার মধ্যে নিয়ে গেল।

হরি দেখল, এদের মধ্যে রাজর্ষি আর থ্রি ম্যাস্কেটিয়ার্স তো আছেই, আরও গোটাকতক বেশ বেশি বয়সের কেঁদো-কেঁদো চেহারার অচেনা ছেলে রয়েছে। প্রত্যেকের হাতেই রড বা লাঠি গোছের অস্ত্র। রাজর্ষির হাতে ঝকঝক করছে একটা ড্যাগার।

রাজর্ষি হাত বাড়িয়ে বলল, "গোপালের চিঠিটা দেখি।"

হরি এত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল যে, জবাব দিতে ভুলে গেল। রাজর্ষি চড়াত করে তার গালে একটা চড় কষিয়ে বলল, "কাল তো খুব তেজ দেখিয়ে গিয়েছিলে! ভেবেছিলে আমরা ভেড়ুয়া? এখন তো আর গোপাল নেই যে, সাহস দেখাবে! চিঠিটা ভালয়-ভালয় বের করে দাও।"

হরি অঙ্ক বই খুলে চিঠিটা বিনা বাক্যব্যয়ে বের করে দিল। রাজর্ষি চিঠিটা পড়ে অন্য একটা ছেলের হাতে দিয়ে হরির দিকে চেয়ে বলল, "তোমার সঙ্গে গোপালের কী কী কথা হয়েছে?"

হরি অবাক হয়ে বলল, "রোজ তোমরা গোপালের কথা জানতে চাও কেন? তার সঙ্গে তো আমার সবে একটু ভাব হয়েছে। এখনও তাকে আমি ভাল করে চিনিও না।"

রাজর্ষি তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে বলল, "গোপালকে আমরা চিনি। বিশেষ কারণ না থাকলে সে সহজে কারও সঙ্গে ভাব করে না। তোমার সঙ্গে যখন ভাব করেছে, তখন কারণও একটা নিশ্চয়ই আছে। আমরা সেই কারণটা জানতে চাই।"

হরি অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বলল, "আমিও কারণটা জানি না। আর কাল রাতে তোমরা যখন কুসুমকুঞ্জে ওকে মেরেছিলে, তখন ও অজ্ঞান হয়ে যায়। অজ্ঞান অবস্থায় কথা বলবে কী করে?"

একথায় সকলেই স্থির হয়ে গেল। রাজর্ষি গলায় একটা বাঘের মতো গর্জন ছেড়ে বলল, "কাল রাতে ওকে আমরা মেরেছি একথা কে বলল?"

"তোমরা ছাড়া আর কে মারবে?"

পটাং করে কার একটা লাঠির ঘা এসে পড়ল হরির বাঁ কাঁধে। যন্ত্রণায় 'ওফ' বলে একটা শব্দ করে সে মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ল। টুলুও চেঁচিয়ে উঠল, "মেরে ফেলল! বাঁচাও।"

তারপর কী হল কে জানে! চারদিক থেকে ছেলেগুলো ঠকাঠক লাঠি আর রড চালাতে লাগল। হরির কোমরে একটা জুতোসুদু পায়ের লাথিও এসে লাগল জোরে। সে মাটিতে পড়ে যেতেই দেখল, একটা ছেলে মস্ত রড় তুলেছে তার মাথা লক্ষ্য করে।

ভয়ে চোখ বুজে ফেলল হরি।

আর চোখ বুজেই শুনতে পেল, কোথা থেকে যেন একটা দ্রুতগামী তেজী ঘোড়া দৌড়ে আসছে। মাটিতে টগবগ শব্দ হচ্ছে তার পায়ের। ঝড়ের মতো বনবাদাড় ভেঙে এসে পড়ল কাছে। খুব কাছে।

আর্তস্বরে কারা যেন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল "পাগলা-সাহেব! পাগলা-সাহেব!"

তারপরেই ভোজবাজির মতো কে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে!

৬. খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে

খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে ভাল করে দম নিল হরি। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে বসল। অদূরে একটা গাছের গোড়ায় টুলুর রোগা শরীরটা নেতিয়ে পড়ে আছে।

হরি গিয়ে টুলুকে নাড়া দিয়ে ডাকল, "এই টুলু, টুলু, তোমার কি খুব লেগেছে?"

টুবলুও ধীরে ধীরে উঠে বসল। মুখে ক্লিষ্ট একটু হাসি। বলল, "লেগেছে তো ভাই খুব। মুখে একটা ঘুসি মেরেছিল জোর। কিন্তু আরও সাজ্ঘাতিক কাণ্ড হতে পারত। পাগলা-সাহেবের জন্য বেঁচে গেছি।"

গায়ের ধুলো ঝেড়ে দু'জনে উঠে দাঁড়ানোর পর হরি জিজ্ঞেস করল, "এই পাগলা-সাহেব কে বলো তো!"

টুলু মাথা নেড়ে বলল, "জানি না।"

"লোকটা মানুষ, না ভূত?"

"তাও জানি না। শুধু জানি, মাঝে-মাঝে পাগলা-সাহেব দেখা দেয়।"

"তা হলে আর-একটা কথার জবাব দাও। পাগলা-সাহেবের কবর বলতে এখানে কিছু আছে কি?"

টুবলু মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক বলতে পারব না। তবে শুনেছি, এরকম নামের একটা কবর কোথাও আছে। তবে সেটা কোথায় তা কেউ জানে না।"

"সেই কবরের কোনও মাহাত্ম্য আছে কি?"

টুলু মাথা নেড়ে বলল, "জানি না। তবে শুনেছি, কবর থেকে পাগলা-সাহেবের কফিনটা যদি কেউ তুলে ফেলতে পারে তবে আর মোতিগঞ্জে পাগলা-সাহেবকে কখনও দেখা যাবে না। আর..."

টুবলু হঠাৎ চুপ করে যাওয়ায় হরি বলল, "আর কী?"

"পাগলা- সাহেবের গলায় একটা মুক্তো বসানো সোনার ক্রস আছে। সেটার দাম লাখ-লাখ টাকা।"

হরি একটু চুপ করে থেকে বলল, "তাই বলো।"

টুবলু মুখের রক্ত হাতের পিঠে মুছে নিয়ে বলল, "তোমার খুব লাগেনি তো!"

"না। মাস্টারমশাইদের বেত খেয়ে-খেয়ে আমার হাড় পেকে গেছে। শোনো, তোমাকে আরআমার সঙ্গে যেতে হবে না। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। এটুকু আমি একাই যেতে পারব।"

টুবলু বলল, "আচ্ছা।" তারপর দুজনে দুজনের কাছে বিদায় নিল।

বাড়ি ফিরে এসে হরি হাতমুখ ধুয়ে ব্যথার জায়গায় একটু মলম ঘষল। বাঁ কাঁধটা ফুলে শক্ত হয়ে উঠেছে। কোমরটাও টনটন করছে। কিন্তু প্রবল মানসিক উত্তেজনায় সে শরীরের ব্যথা তেমন টের পাচ্ছিল না।

পড়তে বসেও সে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। কানে বাজছিল ঘোড়ার পায়ের সেই টগবগ শব্দ। কে পাগলা-সাহেব? কোথা থেকে উঠে আসে? কোথায় চলে যায়?

হঠাৎ খুব কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, "খুব ঠ্যাঙানি খেলে আজ যা হোক! ওঃ, তবু অল্পের ওপর দিয়ে গেছে!"

হরি একটু চমকে উঠে চারদিকে তাকাল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল। জানালা ফাঁকা, আশেপাশে জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। অথচ পটল দাস। যে ভূত নয় তা সে জানে। অথচ গলাটা পটল দাসেরই।

"পটলদা? তুমি কোথায়? অদৃশ্য-ফদৃশ্য হয়ে যাওনি তো?"

"চারদিকে চোখ রাখতে হয় রে ভাই, চারদিকে চোখ রাখতে হয়।"

হরির এবার আর ভুল হল না। পটলের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে ঘরের ভিতরেই, তবে ছাদের কাছ থেকে। দেওয়ালে যে বিশাল অয়েলপেন্টিংটা ছিল সেটা আধখানা সরানো। তার পিছনে একটা চৌকো ফোকর। পটল দাস সেই ফোকর দিয়ে মুখ বের করে খুব হাসছে।

ছবির পিছনে যে একটা ফোকর থাকতে পারে, সে-ধারণাও হরির ছিল। সে ডিটেকটিভ বইটইও বিশেষ পড়েনি যে, এসব কল্পনা করবে। তাই সে খুবই অবাক হয়ে গেল। বলল, "তুমি ওখানে উঠলে কী করে?"

পটল দাস বুড়ো মানুষ। কিন্তু ওই উপর থেকে অনায়াসে বেড়ালের মতো একটা লাফ মেরে মেঝেয় নেমে এল। আশ্চর্যের বিষয়, কোনও শব্দও হল না। নেমে ঘরের কোণ থেকে একটা ঝুলঝাড়ুনি নিয়ে ছবিটা আবার যথাস্থানে ঠেলে ফোকরটা ঢেকে দিল।

তারপর হরির দিকে চেয়ে বলল, "এসব পুরনো আমলের বাড়িতে কত সুড়ঙ্গ, পাতালঘর আর গুপ্ত কুঠুরি যে আছে, তার হিসেব নেই। তা আমিও পটল দাস। লোকে যে আমাকে আদর করে ইঁদুর বলে ডাকত, সেটা তো আর এমনি নয়। সব গর্ত, সব ফোকরের খবর রাখি। ওই ফোকর দিয়ে কতবার এবাড়িতে ঢুকেছি।"

"ঢুকে কী করো?"

পটল দাস একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নেড়ে বলল, "কিছু না রে ভাই, চুরিটুরি আমি ছেড়ে দিয়েছি। শুধু অভ্যাসটা বজায় রাখা। একটু ব্যায়ামও হয়।"

"ওই অত ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামলে, তোমার ব্যথা লাগল না?"

"পাগল নাকি। বায়ুবন্ধন করে নিয়েছিলুম না! একবার কুঞ্জবাবু রাগ করে তিনতলার ছাদ থেকে পাঁজাকোলে তুলে ফেলে দিয়েছিল আমাকে। বুঝলে? তা গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। পড়েই ফের ছাদে গিয়ে কুঞ্জবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললুম, 'কাজটা মোটেই ঠিক করেননি মশাই, ওরকমভাবে ফেলে দিলে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু কুঞ্জবাবু ভাবলে, আমি ভূত, তিনতলা থেকে পড়ে অক্কা পেয়ে ভূত হয়ে শোধ নিতে এসেছি। তাই আমাকে দেখে গোঁগোঁ করে সেই যে অজ্ঞান হলেন, জ্ঞান ফিরল সাতদিন পরে।"

"আমাকে যখন আজ ছেলেগুলো মারছিল তখন তুমি কোথায় ছিলে?"

পটল দাস একটু হেসে বলল, "কাছেপিঠেই ছিলুম। আজকাল সব পুরনো দিনের কথা খুব মনে পড়ে কিনা। ওই যে কুঞ্জবাবুর কথা বললুম, আজ সেই তেনাদেরই তিনতলার ছাদে বসেবসে পুরনো কথা ভাবছিলুম। কুঞ্জবাবু কবে মরে গেছেন, বাড়িটা চামচিকে আর বাদুড়ের বাসা। ছাদে ঘুরে-ঘুরে পুরনো কথা ভেবে মনটা খারাপ লাগছিল।"

"তা হলে সবই দেখেছ?"

"দেখলুম। তবে অল্পের ওপর দিয়ে গেছে।"

হরি এবার নড়েচড়ে বসে বলল, "অল্পের ওপর দিয়ে গেল কেন বলল তো? ছেলেগুলো আমাকে আর টুবলুকে ছেড়ে হঠাৎ পালিয়ে গেল কেন? ঘোড়ায় চড়ে কে এসেছিল তখন?"

পটল দাসের মুখোনা কেমন যেন তোম্বা হয়ে গেল। মাথা নেড়ে বলল, "ঘোড়া! না তো, সেরকম কিছু দেখিনি।"

"চেপে যাচ্ছ পটলদা? তুমি সব জানো।"

"কী দেখব? বলেছি না, চোখে ছানি। প্যালারাম কাটিয়ে দেবে বলেছে। তারপর নাকি আবার সব দেখতে পাব আগের মতো।"

"তা হলে আমার মার খাওয়াটা দেখলে কী করে?"

পটল দাস বিরক্ত হয়ে বলল, "তোমার সঙ্গে কথা বলাটাই বাপু, বড় ভজকট ব্যাপার। ডাক্তারের ছেলে হয়ে যে কেন উকিলের ছেলের মতো জেরা করো।"

হরি হেসে ফেলল। বলল, "পাগলা-সাহেবের কথাটা তা হলে স্বীকার করবে না?"

পটল দাস তাড়াতাড়ি ডান কানে একটা আঙুল ভরে নাড়া দিতে দিতে বলল, "ওই দ্যাখো, সেই শ্যামাপোকাটা ফের কুটকুট করে কামড়াতে লেগেছে। তা ওরা তোমাকে ধরেছিল কেন বলো তো! কী চায় ওরা?"

"সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। দু' দিনই ওরা আমাকে ধরল গোপালের খবর জানবার জন্য। গোপাল আমাকে কী বলেছে না বলেছে এইসব। কিন্তু আমাকে কেন ধরে বলো তো! গোপালের খবর তো গোপালের কাছ থেকেই নিতে পারে। আমি গোপালের কী জানি।"

পটল দাস বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, "সেইটেই তো কথা। তবে কিনা তোমার কপালে আরও কষ্ট আছে।"

হরি চোখ বড় বড় করে বলল, "কেন পটলদা, আমি কী করেছি?"

"তেমন কিছু করোনি বটে, কিন্তু এই বাড়িতে যে এসে জুটেছ, এইটেই অনেকে ভাল চোখে দেখছে না। এই বাড়ির ওপর অনেকের নজর আছে। তার ওপর গোপাল হঠাৎ আলটপকা তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল কেন, সেটাও ভাববার কথা।"

হরি অবাক গলায় বলল, “এবাড়িতে আছি বলেই বা কী দোষ হয়েছে, আর গোপাল আমার বন্ধু বলেই বা কী অন্যায়টা হল, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।”

পটল দাস খুব বিজ্ঞের মতো হেসে বলল, “এই মোতিগঞ্জে ষাট-সত্তরটা বছর কাটিয়ে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, তবু আমিই এখনও কত কথা বুঝতে পারি না, আর তুমি তিনদিনের ছোঁকরা, সব বুঝে ফেলবে? মোতিগঞ্জ জায়গাটা অত সোজা নয় রে বাপু। এখানে খুব হিসেব কষে থাকতে হয়। এমনিতে বাইরে থেকে দেখে মনে হবে বুঝি বেশ নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট, ঠাণ্ডা, সুন্দর একখানা শহর। কিন্তু যত এখানে থাকবে তত বুঝবে যে, এখানে চারদিকে খুব শক্ত-শক্ত আঁক।”

“আঁক? সে আবার কী?”

“আঁক বোঝো না? আঁক মানে অঙ্ক আর কি। আঁক যেমন শক্ত, এখানে প্রতিটি ব্যাপারই তেমনি শক্ত। চট করে সব বোঝা যায় না। কেন যে কী হয়, তা খুব ভেবেচিন্তে বার করতে হবে। তোমার ব্যাপারটা নিয়েও ভেবে-ভেবে একটা কিছু বের করে ফেলব’খন। তবে দুখিরামবাবু এবাড়িটা কিনে ভাল কাজ করেননি।”

“কেন। এ বাড়ি কিনে খারাপ কী হয়েছে?”

“বললুম না এবাড়িটার ওপর অনেকের নজর আছে।”

“দুখিরামবাবু বাড়িটা কেনার আগে তো বাড়িটা এমনিই পড়ে ছিল। তখন নজর ছিল না?”

পটল দাস মাথা চুলকে বলল, “না, তখন ছিল না। এই হালে নজরটা খুব পড়েছে। আর তারা তোক সুবিধের বলেও মনে হচ্ছে না।”

“তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ না তো পটলদা?”

পটল মাথা নেড়ে বলল, "না রে বাপু, তোমাকে ভয় দেখানো ছাড়া কি আমার কাজ নেই। লোকগুলো মোতিগঞ্জের নয়। বাইরের লোক। তারা এখানে ইতিউতি কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওই 'কুসুমকুঞ্জ' আর এই 'গ্রিন ভ্যালি'-এই দু'খানা বাড়ির ওপরেই নজর।"

"তারা কী খুঁজছে পটলদা? পাগলা-সাহেবের কবর নয় তো!"

"রাম রাম, কী যে সব বলো না! ও সব মুখে উচ্চারণও করতে নেই।"

"আমি জানি পটলদা। পাগলা-সাহেবের গলায় একটা দামি ক্রস আছে। আর পাগলা-সাহেবকে কবর থেকে তুলতে পারলেই তাকে আর মোতিগঞ্জে দেখা যাবে না।"

পটল দাস জুলজুল করে কিছুক্ষণ হরির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "টুবলু ছোঁড়াটা মহা পাজি। তুমি বাইরের লোক, খামোখা তোমাকে অত কথা বলে দিয়ে বিপদে ফেলা হল। না জেনেই ভাল ছিল।"

হরি কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, "খানিকটা যখন জেনেই ফেলেছি পটলদা, তখন পুরোটাই আমাকে জানিয়ে দাও। পাগলা-সাহেবের কবর কোথায়, তা কি তুমি জানো?"

পটল দাস একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল, "না রে ভাই, কেউই জানে না। 'মেঠো ইঁদুর' বলে সবাই আমাকে ডাকে, তবু আমিও আজ অবধি হদিস করতে পারিনি। অনেক খুঁজেছি।"

"তুমি পাগলা-সাহেবকে দেখেছ কখনও? জ্যান্ত অবস্থায়?"

"জ্যান্ত দেখিনি। পাগলা-সাহেব মরেছে বোধহয় সত্তর-আশি বছর আগে। কোন বাড়িতে যে সে থাকত তাও কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। সে মারা যাওয়ার পর তার বিশ্বাসী কয়েকজন চাকর তাকে গোপনে কোথাও কবর দিয়ে দেয়। সে কবরেরও হদিস নেই। তবে ইদানীং পাগলা-সাহেব সম্পর্কে কোন খবরের কাগজে নাকি কী একটা গপ্পো বেরিয়েছে। তারপর থেকে নানারকম খোঁজখবর হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, কুসুমকুঞ্জ আর গ্রিন

ভ্যালি, এই দুটো বাড়ি নিয়েই নাকি পাগলা-সাহেব থাকত। গ্রিন ভ্যালিতে থাকত তার চাকরবাকর, খানসামা, বাবুর্চিরা; আর সে নিজে থাকত কুসুমকুঞ্জে। সত্যি-মিথ্যে জানি না। সেই গল্পে আরও লিখেছ যে, পাগলা-সাহেবের গলায় যিশুবাবার যে মাদুলি আছে, তার নাকি লাখ-লাখ টাকা দাম।"

"তুমি কি সেই গল্প শুনেই কবরটা খুঁজতে লেগেছ?"

তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে পটল বলল, "না রে বাবা, না; এ-গল্প আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। মোতিগঞ্জের লোকেরা আর যা-ই করুক, পাগলা-সাহেবের কবরে হাত দেবে না। বারণ আছে। সাহেব মোতিগঞ্জের লোকদের জন্য করেছেও অনেক। গরিব-গুবোদের খুব দেখত, চোর গুণ্ডা বদমাসদের টিট রাখত, তার ভয়ে গোটা মোতিগঞ্জে কোনও অশান্তি ছিল না। নিজে ছিল সাধু প্রকৃতির। দুটো কয়লাখনি আর একটা মস্ত কাঠের কারবার ছিল তার। দেদার টাকা রোজগার করত, আর দু'হাতে বিলিয়ে দিত। মরলও মানুষের ভাল করতে গিয়ে। একদিন একটা উটকো লোক এসে সাহেবের পায়ের ওপর পড়ে বলল, "হুঁজুর, গাঁয়ের লোকেরা আমার ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে, বউবাচ্চা সব মেরে ফেলেছে, আপনি বিহিত করুন। আমি ছোট জাত, চাষবাস করে গতরে খেটে অবস্থা একটু ফিরিয়েছি দেখে গাঁয়ের লোকের চোখ টাটাচ্ছে।' সাহেব দুর্বলের ওপর অত্যাচার সইতে পারত না। শুনেই ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল একা। তা বেশিদূর যেতে হয়নি। শহরের পুব দিকে মস্ত জংলা জমিটায় পড়তেই প্রায় বিশজন লোক সাহেবকে সড়কি বল্লম আর তীর মেরে ঝাঁঝরা করে দিল। চাকরেরা একটু দেরিতে খবর পেয়ে যখন দৌড়ে গেল, তখনও ডাকাতেরা সাহেবের গলা থেকে যিশুবাবার মাদুলিটা খুলে নিতে পারেনি। তাড়া খেয়ে তারা পালিয়ে যায়। চাকরেরা সাহেবকে নিয়ে এসে গোপনে কবর দিয়ে দেয়।"

"গোপনে কেন?"

"কে জানে কেন। তবে সাহেব নাকি তার চাকরদের বলেই রেখেছিল, হঠাৎ তার মরণ হলে এমন জায়গায় যেন কবর দেওয়া হয়, যা কেউ খুঁজে পাবে না। "

"সেই চাকরেরা কোথায় গেল?"

"তা-ও কেউ জানে না। সাহেব মারা যাওয়ার পরদিন থেকেই সব ভোঁভাঁ। পুরনো লোকরা বলে, সাহেব নাকি তাদের বলে রেখেছিল, তিনি মারা যাওয়ার পরেই যেন সকলে গায়েব হয়ে যায়। তা লোকগুলো সাহেবকে একেবারে দেবতুল্য ভক্তি করত। তার কথায় উঠত বসত। সাহেবের আদেশও তারা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে গেছে।"

"কিন্তু একটা কথা পটলদা। সাহেব তো শুনি এখনও যখন-তখন দেখা দেয় আর লোককে বিপদ থেকে বাঁচায়। আজ আমাকেও বাঁচিয়েছে। তা নিজের কবরটা কি সাহেব আর বাঁচাতে পারে না? দুশমনদের তো সাহেব নিজেই তাড়িয়ে দিতে পারে।"

"সেও আর-এক গল্প। মাঘ মাসের শেষ দিকটায় যে-দিনে সাহেব খুন হয়, সেই দিনটায় সাহেব নাকি কবর থেকে বেরোয় না। শুয়ে-শুয়ে মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা ভেবে কাঁদে। সেই দিনটায় যদি কেউ কবর খুঁড়ে তাকে বের করতে পারে তো সাহবকে আর কখনও দুনিয়ায় দেখা যাবে না। সাহেব বলেই গেছে, অচেনা লোক তার কবর ছুঁলে তার আত্মা বহুদূর চলে যাবে, সেই দিনটা পড়বে সামনের অমাবস্যায়। আর সাতদিন বাকি।"

"তা থাক না। ভূত কি ভাল?"

পটল দাস মাথা নেড়ে বলল, "ভূত হোক যা-ই হোক, মোতিগঞ্জের লোক পাগলা-সাহেবকে বড় ভালবাসে। আমরা মোতিগঞ্জের লোকেরা তার কবরটা খুঁজছি কেন জানো? যাতে আমাদের আগে অন্য কোনও বদমাস তা খুঁজে না পায়। আমরা খুঁজে পেলে সেই কবরের চারধারে শক্ত পাহারা বসাব।"

"কী করে খুঁজে পাবে? কোনও চিহ্ন আছে?"

"আছে। তবে সে-সব আর জানতে চেও না। বিপদে পড়বে।"

এ-সব কথা বিশ্বাস করবে কি না, তা নিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ল হরি। সে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পটল দাস ক্রুদ্ধ একটা চাপা গর্জন করে জানালার দিক ছুটে গেল!

চমকে উঠে হরি বলল, "কী হল পটলদা?"

পটল জানালার ওপর ঝুঁকে বাইরে কী দেখতে লাগল। জবাব দিল। তারপর মুখটা ফিরিয়ে চাপা গলায় বলল, "তুমি একটি নষ্টচন্দ্র।"

"তার মানে?"

"তখন থেকে নানা কথায় ভুলিয়ে আমার পেট থেকে কথা বের করছ। আর আমারও বুড়ো বয়সে এখন বকবকানিতে পেয়েছে। হুট বলতে যার-তার সঙ্গে বকবক করতে লাগি।"

"তাতে কী হয়েছে?"

"হবে আবার কী? কোন নচ্ছার যেন জানালায় দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিল।"

হরি একটু সিটিয়ে গেল।

পটল দাস মাথা নেড়ে বলল, "গতিক খুব সুবিধের নয় রে বাপু। গোপালটাকে মারল, তোমাদের ওপর হামলা হল, গতিক আমার ভাল ঠেকছে না।"

হরি এবার একটু রাগ করে বলল, "তোমাদের পাগলা-সাহেব তো খুব বীর। কাল রাতে যখন গোপালকে ওরা মারল, তখন তাকে বাঁচাতে আসেনি কেন?"

পটল দাস হরির দিকে কুতকুত করে চেয়ে থেকে বলল, "না বাঁচালে গোপাল বেঁচে আছে কী করে? যারা ইট মেরেছিল, তারা কি সোজা লোক? অল্পে ছেড়ে দিত নাকি ভেবেছ? গোপালের মতো ডাকাবুকো ছেলেকে নাগালে পেলে খুন করে ফেললেই তাদের সুবিধে। করতে যে পারেনি, সে ওই পাগলা-সাহেবের জন্যই।"

"কিন্তু ইটের ঘা-ই বা খেল কেন?"

"অত আমি জানি না। তবে যিশুবাবার যেমন অনেক ক্ষমতা, তেমনি শয়তানেরও অনেক ক্ষমতা। এই ধরো না মোতিগঞ্জের দারোগাসাহেবের ক্ষমতা তো কিছু কম নয়। কিন্তু তবু এই পটল দাসের মতো লোকও তো এখানে বেঁচে-বর্তে করে-কম্মে খাচ্ছে। ক্ষমতা পটল দাসেরও তো কিছু আছে।"

"তা বটে।"

"এও তাই। মোতিগঞ্জের লোকেদেরও ঘরে চুরি হয়, তারা হোঁচট খায়, অপঘাত হয়, মারদাঙ্গা গুণ্ডামি-ষণ্ডামিও মেলা আছে। পাগলা-সাহেব কি সব কিছুতে গিয়ে জোটে? তবে মাঝে-মাঝে দেখা দেয় বটে। সে তার ইচ্ছেমতো। কখন কবর থেকে বেরিয়ে আসবে, তার কিছু ঠিক নেই। লোকটা পাগলা ছিল তো। কিন্তু মেলা কথা হয়ে গেছে। আর নয়। ঝুমরি তোমার ভাত নিয়ে এল বলে। রাতও হয়েছে।"

"কিন্তু গল্পটা যে আমার আরও শুনতে ইচ্ছে করছে!"

"ওরে বাবা! এ গল্প শুনতে বসলে রাতের পর রাত কাবার হয়ে যাবে, তবু শেষ হবে না। আমার খিদেও পেয়ে গেছে খুব। প্যালারামের মা আজ ফুলকপি দিয়ে জব্বর খিচুড়ি রাঁধছে দেখে এসেছি। জুড়িয়ে গেলে খিচুড়িতে আর গোবরে তফাত নেই।"

এই বলে পটল দাস দরজা খুলে সাঁত করে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঝুমরি তার খাবার নিয়ে ঢুকল ঘরে।

৭. খেয়েদেয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ

খেয়েদেয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে এইসব ঘটনা ভাবতে লাগল হরি। ভেবে কোনও কূল-কিনারা পেল না। মাথা গরম হয়ে গেল।

হঠাৎ তার নজর গেল দেওয়ালের ছবিটার দিকে। ওর পিছনে একটা গুপ্ত দরজা আছে। হরি আর দেরি করল না। জানালার পাল্লা ভাল করে এটে পদা টেনে দিল, যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পায়। তারপর টেবিলটা দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে তার ওপর চেয়ার তুলল। চেয়ারের ওপর দাঁড়াতেই ছবি তার নাগালে এসে গেল।

ছবিটা একটু ঠেলতেই সরে গেল। পিছনে ফোকর। টর্চ পকেটে নিয়ে বুক ঘষটে, হাতে ভর দিয়ে সে উঠে পড়ল সুড়ঙ্গের মুখে। তারপর ছবিটা টেনে গর্তটা ঢেকে দিল।

টর্চ জ্বেলে চারধারটা দেখল সে। খুবই সঙ্কীর্ণ একটা গলির মতো জায়গা। মাথা নিচু না করলে ছাদে মাথা ঠেকে যায়। টর্চ ফেলে কয়েক পা এগোল হরি। গলিটা তার ঘরের সমান্তরাল খানিকদূর গিয়েই একটা সিঁড়ির মুখে শেষ হয়েছে। খাড়া সিঁড়ি। ধাপগুলো বেশ উঁচু-উঁচু।

পটল দাস এই পথে আনাগোনা করে, সুতরাং ভয় পাচ্ছিল না হরি। সে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল। নামতে নামতে মনে হল সে পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে। তার ঘরের মেঝের অনেক নীচে।

সিঁড়ি যেখানে শেষ হল সেটা একটা অপরিসর ঘর। ঘরে কিছুই নেই। শুধু একধারে একটা মাদুর পড়ে আছে। মাদুরের ওপর একটা দেশলাই আর কয়েকটা বিড়ি। হরি বুঝল, পটল দাস মাঝে-মাঝে এখানে বিশ্রাম করতে আসে।

সিঁড়ির উলটো দিকের দেওয়ালে আর-একটা দরজা দেখা গেল। লোহার দরজা, বেশ মজবুত। তবে হুড়কো বা ছিটকিনি নেই। হরি দরজাটা খুলে আর-একটা গলি দেখতে পেল।

গলি ধরে বেশ অনেকটা সমতলে হাঁটল হরি। তারপর আচমকাই টের পেল, গলি ঢালু হয়ে নেমে যাচ্ছে।

নামতে নামতে ফের আরও দু-তিনতলা নেমে এল হরি। গলিটা শেষ হল একটা গোল ঘরের মধ্যে। কোনও দরজা, জানালা, ফোকর কিচ্ছু নেই। চারদিকে নিরেট দেওয়াল আর ছাদ। আগে হয়তো টাকাকড়ি সোনাদানা লুকিয়ে রাখা হত এখানে।

হরি টর্চ জ্বেলে খুব ভাল করে চারদিকটা দেখল। বিড়ির টুকরো দেখে বুঝল, পটল দাস এখানেও আসে। সুতরাং এখানে নতুন কিছু আবিষ্কার করার আশা বৃথা।

ফিরে আসবে বলে হরি যখন ওপর দিকে উঠছে তখন মাঝপথে সে বাঁদিকে আরও একটা ফোকর আবিষ্কার করল। দেওয়ালের খাঁজে খুবই সঙ্কীর্ণ একটা ফাটলের মতো, নামবার সময় চোখে পড়েনি।

হরি তাতে মুখ বাড়িয়ে দেখল, ভিতরে খুব সরু একটা গলিপথ। এ-পথও পটল দাসের চোখ এড়ায়নি নিশ্চয়ই। সে সন্তর্পণে ভিতরে পা দিল।

এ-পথটাও নীচে নেমেছে। হরি হাঁটতে লাগল।

বেশ খানিকটা হাঁটার পর পথ আবার ওপরে উঠতে লাগল। অবশেষে খানিকটা সিঁড়ি বেয়ে হরি যেখানে এসে দাঁড়াল, সেটা একটা বন্ধ দরজা। ঠেলল। দরজাটা খুলল না।

একটু ভাবল হরি। দরজা? নাকি তার ঘরের মতোই এখানেও ছবি?

সন্তর্পণে দরজাটাকে পাশের দিকে ঠেলল হরি। নিঃশব্দে দরজা সরে গেল। সামনেই একটা ঘর। তবে প্রায় দশ ফুট নীচে তার মেঝে। হরি ঠিক তার ঘরের ছবির পিছনকার মতোই একটা গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তবে নীচের ঘরটা তার নয়। অন্ধকার হলেও বুঝতে পারছিল হরি। তার মনে হল, এটা দুখিরামবাবুর গ্রিন ভ্যালির কোনও ঘরও নয়।

তবে কি কুসুমকুঞ্জ? গায়ে একটু কাঁটা দিল হরির।

দম চেপে কিছুক্ষণ নীচের অন্ধকার ঘরটার দিকে চেয়ে রইল সে। টর্চটা জ্বেলে দেখতে তার কেমন যেন সাহস হল না। তার মনে হচ্ছিল, ঘরটা জনশূন্য না-ও হতে পারে। কেউ যদি ঘাপটি মেরে থেকে থাকে তবে মুশকিল হবে।

অন্ধকার হলেও আবছাভাবে হরি দেখতে পাচ্ছিল, ঘরে কিছু আসবাবপত্র রয়েছে। উলটো দিকে একটা জানালা দিয়ে বাইরের খুব মৃদু আলোর আভাস আসছে। তাই দিয়ে যতটা দেখা যায় তাতে হরির মনে হল, ঘরটা ফাঁকাই।

সাহস করে এবার টর্চটা জ্বালল সে।

সাধারণত বড়মানুষদের বসবার ঘর যেমন হয় তেমনি সাজানো। সোফাসেট, একটা ডিভান, টেবিল। তবে আসবাবগুলো বড্ড পুরনো আর ভাঙাচোরা। দেওয়ালে নোনা লেগেছে, ঘরের কোণে-কোণে ঝুল জমেছে মেলা। তবে মেঝেয় তেমন ধুলোর আস্তরণ দেখতে পেল না সে।

তবে কি এখানে লোকজনের আনাগোনা আছে? হঠাৎ বাইরে থেকে একটা শব্দ এল। মনে হল জানালার ওপাশে কে যেন মাটিতে আছাড় খেল ধপাস করে। তারপর একটা চেনা গলার আর্তনাদ, "ওরে বাবা রে!"

টপ করে টর্চটা নিবিয়ে দিল হরি। বাইরে কিছু-একটা হচ্ছে। কে যেন চাপা গলায় বলল, "চল ব্যাটা, সত্যি কথা না বললে আজ তোকেই কবর দেব।"

"আমি কিছু জানি না।"

"জানিস কি না জানিস সেটা বোঝা যাবে ওষুধ পড়লে।"

"উঃ, ঘাড় ভেঙে যাবে যে..."

"ভাঙবার জন্যই তো রদ্দা দেওয়া হচ্ছে।"

"ছেড়ে দাও বাবারা, আমি বুড়ো মানুষ।

"বুড়ো! বর্টে! কিন্তু তোমার বুড়ো হাড়ে যে ভেলকি খেলছিল বাবা একটু আগে! আমাদের তিন-তিনটে মরদকে যে তুমি ঘায়েল করেছ বুড়ো শয়তান! এখন আবার ন্যাকার মতো বুড়ো সাজা হচ্ছে?"

"আ হা হা, হাতটা যে গেল! অত জোরে মোচড়ায় নাকি রে! এ কি বাপু ইস্টিলের জিনিস?"

পটাং করে একটা শব্দ হল। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

তারপর একটা ভারী জিনিসকে হেঁচড়ে আনার শব্দ হল। কে যেন চাবি বের করে তালা খুলছে ঘরের।

হরি ছবিটা খুব সন্তর্পণে টেনে গর্তটা ঢেকে দিল। শুধু চুলের মতো একটু ফাঁক রাখল।

বাঁ ধারে একটা দরজা কাঁচকোঁচ করে খুলে গেল। চারজন লোক পঞ্চম আর-একটা লোককে হেঁচড়ে টেনে এনে ঘরের মেঝের ওপর ফেলে দিল।

মেঝেয় পড়ে থাকা লোকটা যে পটল দাস তাতে সন্দেহ নেই হরির। কিন্তু পটল তো খিচুড়ি খেতে বাড়ি গেল। তাকে এরা পেল কোথায়?

আর লোক গুলোই বা কারা?

লোকগুলো একটা মোমবাতি ধরিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। সেই আলোয় হরি দেখতে পেল, চারজনের একজন গদাধর। আর তিনজনই অচেনা। তবে তাদের চেহারা এবং চোখমুখ দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, এরা ভাল লোক নয়।

পটল দাস মেঝের ওপর পড়ে গোঙাচ্ছিল।

কোমরে ভোজালিওলা বেঁটে এবং ভারী জোয়ান একটা লোক বলল, "এ, এই উটকো বুড়োটার জন্য বহুত পরেসানি গেছে। কে জানত যে ব্যাটা কুংফু-কারাটে জানে।"

হাতে একটা ছোট লাঠিওলা কালো ডাকু চেহারার লোক বলল, "আমি তো ভাবলুম এটা মানুষই নয়। ভূতফুত হবে। নইলে রাজু, দিপু আর অনিলকে ওভাবে শুইয়ে দেওয়া কি যার-তার কাজ!"

বেঁটেটা বলল "ওদের কী হল? কে দেখছে ওদের?"

"চালু আছে। চোট তেমন সাজ্ঘাতিক নয়। শক্ত ছেলে। উঠে পড়বে।"

বেঁটেটা কিছুক্ষণ পটল দাসের দিকে চেয়ে থেকে গদাধরের দিকে চোখ তুলে বলল, "গদাই, তা হলে এই লোকটাই?"

"হ্যাঁ, হরিবন্ধুর ঘরে একেই দেখেছি। এর নাম পটল দাস। একসময়ে নাম-করা চোর ছিল।"

"চোর! ভেরি গুড। চোরেরাই সব অন্ধিসন্ধির খবর রাখে।"

গদাধব ওরফে গদাই বলল, "পটল দাস হরিবন্ধুকে বলছিল, পাগলা-সাহেবের কবর খুঁজে বার করার সঙ্কেত ও জানে।"

বেঁটেটা ডাকু লোকটাকে বলল, "বাইরে বাগানের কল থেকে একটু জল এনে চোরটার মুখে-চোখে ঝাঁপটা দে। পেট থেকে কথা বের করতে হবে।"

জলের ঝাঁপটা দেওয়ার কথাতেই কি না কে জানে, পটল দাস একটু ককিয়ে উঠে বলল, "পেটে কি আর কথা আছে বাপু? এখন যে নিজের বাবার নামটাও ভুলে বসে আছি। না বাপু, মাথায় গাঁট্টা মারাটা তোমাদের উচিত হয়নি।"

একথায় চারজনই পরস্পর একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বেঁটেটা দাঁত কড়মড় করে বলল, "ওরকম চোরের মার খেয়েও তোমার কিছু হয়নি দেখছি। বেশ শক্ত ধাতের লোক তো তুমি। কিন্তু তার চেয়েও শক্ত ওষুধ আমাদের কাছে আছে তা জানো?"

পটল দাস ভারী অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "কিছু হয়নি মানে? কে বলল কিছু হয়নি? ঘাড়টা টনটন করছে, মাজা ঝনঝন করছে, হাত কনকন করছে, চোখে সর্ষেফুল দেখছি! তবু বলছ কিছু হয়নি? আর আমি তো চোর নই যে, চোরের মার হজম করতে পারব।"

বেঁটে লোকটা ভোজালির বাঁটে হাত রেখে বলল, "আমরা যা জানতে চাই তা যদি সাফ-সাফ না বলো, তা হলে জানে খতম হয়ে যাবে, তা বুঝতে পারছ? তিনটে আনাড়িকে ঘায়েল করেছ বলে যে আমাদেরও জব্দ করবে সে আশা কোরো না। এবার আর রদ্দাফদ্দা নয়, স্রেফ গলা ফাঁক করে দেব।"

"অত ভয় দেখাতে হবে না। ভয় আমি পেয়েই আছি। কিন্তু জানলে তো বলব বাবারা! আমি তো সাতে-পাঁচে থাকি না। আমার ছেলে প্যালারাম রেলে চাকরি পেয়ে গেছে। সে টাকা পাঠাতে শুরু করলেই আমরা বুড়োবুড়ি কাশীবাসী হব। আর এ-তল্লাটে নয়। বুড়োবয়সে বড় হেনস্থা হতে হচ্ছে গো।"

"এঃ, একেবার ধর্মের ষাঁড়! কাশীবাসী হবেন। কাশী তোমাকে এখানেই বাস করাচ্ছি।"

এই বলে বেঁটে লোকটা পটলের ঘাড়টা ধরে টেনে দাঁড় করাল। তারপর পটাস করে গালে একটা চড় কষিয়ে বলল, "কাশীবাসী বুড়ো, তা তুমি যদি এতই ধাম্মিক তা হলে আমার দলের তিনটে ছেলেকে অমন গুণ্ডার মতো মারধর করলে কেন?"

চড় খেয়ে পটল দাস গালে হাত বোলাতে-বোলাতে অবাক গলায় বলল, "দুধের বাছাদের আমি আবার মারলুম কখন? আমবাগানের ভিতর দিয়ে পেটে খিদে নিয়ে যাচ্ছিলুম বাবারা, আমার দোষঘাট নিও না। পেটে তখন চোঁচা খিদে। ওদিকে বাড়িতে আজ ফুলকপি আর ভাজা-মুগের ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না হয়েছে। সেই অবস্থায় তোমরা সব এসে আমাকে ঘিরে ধরলে। তখন কি খিদের চোটে মাথার ঠিক ছিল বাপ! বুড়োমানুষ, খিদে আর ভয়ে বেমক্কা হাত-পা ছুঁড়েছি হয়তো, তাইতেই দুধের বাছাদের একটু লেগেছে। তবে ইচ্ছে করে কিছু করিনি বাবারা।"

বেঁটেটা দু'কোমরে দু'হাত রেখে বুক চিতিয়ে বলল, "তা আমরাও তোমার গায়ে ইচ্ছে করে হাত তুলছি না বুড়ো-ঘুঘু। আমাদের হাত আপনা থেকেই উঠে যাচ্ছে। এখন বলো তো বাছাধন, তোমাদের পাগলা-সাহেবের কবরটা কী করে খুঁজে পাব?"

পটল দাস কানে হাত চাপা দিয়ে সভয়ে বলল, "রাম রাম, রাম রাম। রাতবিরেতে ওসব নাম উচ্চারণ করতে নেই। উনি কুপিত হবেন।"

গদাধর গর্জন করে বলল, "ব্যাটা ইয়ার্কি করছে। একটু আগেই হরিবন্ধুকে বলছিল, আমি নিজের কানে শুনেছি।"

বেঁটেটা চতুর্থজনের দিকে ফিরে বলল, "তুই গিয়ে হরি ছোঁড়াটাকে ধরে নিয়ে আয় তো। দু'জনের মধ্যে যখন এত ভাব, তখন দু'জনের পেট

থেকেই কথা বার করা যাক।"

চতুর্থজন এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। চারজনের মধ্যে সেই সবচেয়ে লম্বা আর চওড়া। একখানা দানব বললেই হয়। নিঃশব্দে ঘাড়টা একটু কাত করে চলে যাচ্ছিল। পিছন থেকে গদাধর বলল, "ওবাড়িতে একটা দরোয়ান আছে। বিশাল চেহারা। সে খুব ঘুমোয়। যদি হঠাৎ জেগে যায় তবে চপারটা চালিয়ে দিস।"

লোকটা চলে গেল।

ভয়ে হরির হাত-পা হিম হয়ে এল। সে যতদূর জানে, জগুরাম এ-সময়টায় তুলসীদাসের দোহা পড়ে। একটু রাতে ঘুমোতে যায়। হয়তো এখনও ঘুমোয়নি। কী হবে তা হলে?

হঠাৎ সে তাকিয়ে দেখল পটল দাস কেমন অদ্ভুত চোখে তার দিকেই চেয়ে আছে। না, পটলদা নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু কিছু একটা আন্দাজ করেছে। ছবিটা যে একটু সরানো, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। বোধহয় অনুমান করছে যে, ছবির আড়াল থেকে কেউ দেখছে তাদের।

পটল হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠে বলল, "কপালে এত দুঃখুও ছিল রে প্যালারাম! কোথায় রে প্যালা, কোথায় পালিয়ে রইলি বাপ! প্যালা! প্যালা! প্যালা রে!"

"চোপ!" বেঁটেটা গর্জন করে উঠল। কিন্তু হরির আজকাল বুদ্ধি খুলেছে। হয়তো বিপদে পড়লেই মানুষের বুদ্ধি খোলে। পটলদা যে কৌশলে তাকে পালিয়ে যেতে বলছে, এটা বুঝতে তার একটুও দেরি হল না। একমাত্র পটলই বোধহয় বুঝতে পেরেছে, ছবির পিছনে কে।

হরি দ্রুতপায়ে যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথে ফিরে চলল। কিন্তু মুশকিল হল টর্চটা জ্বলছে না। ব্যাটারি কমজোরি হয়ে পড়েছিল। এখন একেবারেই গেছে। সামনে ঘুটঘুটি অন্ধকার। হরি তবু সিঁড়ি ভেঙে নেমে গলিটা পেয়ে হাঁটতে লাগল, অন্ধকারে যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে।

কিন্তু হঠাৎ তার মনে হতে লাগল, সে ভুল পথে যাচ্ছে।

আসার সময় সে অবশ্য একটা গলি ধরেই এসেছিল। অন্য কোনও সুড়ঙ্গ তার নজরে পড়েনি। কিন্তু নিবুনিবু টর্চের আলোয় গভীর অন্ধকার সুড়ঙ্গে সে আর কতটুকুই বা দেখেছে! আন্দাজে সে বুঝল, এতক্ষণে তার গলির মুখে পৌঁছে যাওয়া উচিত। কিন্তু পৌঁছয়নি। ওদিকে গুণ্ডাটা গেছে তাকে ধরে আনতে। জগুরাম বাধা দিলে খুন হয়ে যাবে। তারপর গুণ্ডাটা তার ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর চেয়ার দাঁড় করানো দেখে সন্দেহ করবে। সুড়ঙ্গের পথ খুঁজে বের করতে তার মোটেই দেরি হবে না। হরি যদি তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছতে পারে এবং লাঠিটা বাগিয়ে ধরতে পারে তা হলে হয়তো শেষরক্ষা হয়।

কিন্তু অন্ধকারে আরও মিনিট-দুই জোর কদমে হেঁটেও কোথাও গলির মুখ পেল না হরি। পথটা যেন বড্ড গড়িয়ে নামছে এবার। মাটির সোঁদা গন্ধ আসছে নাকে।

হরি একটু দাঁড়াল। মাটির তলাটা ভীষণ নিস্তব্ধ। কবরের মতো নিথর। অন্ধকার এত জমাট যে, মনে হয় অন্ধ হয়ে গেছি।

হরির এবার ভয় করতে লাগল। এই অন্ধকার থেকে তাকে বেরোতেই হবে। যেমন করে হোক। সে হঠাৎ প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল।

আর বিপদটাও ঘটল সঙ্গে-সঙ্গে। দড়াম করে একটা হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ল সে। তারপর ঢালু বেয়ে অনেকটা গড়িয়ে গিয়ে ফের ধাক্কা খেল একটা কাঠের তক্তায়। মাথায় চোট পেল। কনুই ছড়ে গেল, হাঁটুতেও বেশ লাগল তার। মাথাটা ঝিমঝিম করায় কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল সে।

তারপর চোখ খুলল।

আশ্চর্য! সুড়ঙ্গের ভিতরে একটা নীলচে আলো না! হরি তাকিয়ে দেখল, তার পিছনেই একটা ছোট্ট চৌকো কপাট একটু ফাঁক হয়ে আছে। ভারী নরম নীল একটা আলো ঠিকরে আসছে ওপাশ থেকে।

হামাগুড়ি দিয়ে গর্তের মধ্যে সাবধানে মুখ বাড়াল সে। তারপর বিস্ময়ে ‘থ’ হয়ে গেল। যা দেখল তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

দেখল, ফোকরের নীচে চমৎকার একখানা ঘর। সাধারণ ঘর নয়। কুয়োর মতো গোল হয়ে নেমে গেছে। অনেক নীচে, প্রায় বিশ ফুট গভীরে ঘরখানা দেখা যাচ্ছে। নীল আলোয় ভরে আছে ঘরখানা। সেই ঘরে কিছুই প্রায় নেই। একধারে লম্বা একটা কাঠের বাক্স। অন্য ধারে একটা ডেকচেয়ার।

প্রথমটা ভাল দেখতে পাচ্ছে না হরি। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর তার মনে হল, ডেকচেয়ারের ওপর রোগা একজন মানুষ শুয়ে আছে। খুব রোগা, সাদা চুল, ধপধপে ফসা রং। পরনে নীল রঙের একটা ড্রেসিং গাউন।

লোকটা কে? ও ঘরটাই বা কোন বাড়ির? হরির মনে হল, এটা গ্রিন ভ্যালি বা কুসুমকুঞ্জ নয়। সুড়ঙ্গ ধরে সে ভুল পথে অন্য কোনও বাড়িতে চলে এসেছে।

সে যাই হোক, এখন তার সাহায্য দরকার। যেমন করেই হোক, এই অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে তাকে গ্রিন ভ্যালিতে ফিরতে হবে। ওই রোগা লোকটাকে তার শত্রুপক্ষের বলে মনে হচ্ছিল না। আর যদি হয়ও তো, কীই বা করার আছে!

সে দেখতে পেল, লোকটা ডেকচেয়ারে শুয়ে একটা বই পড়ছে যেন। হরি ডাকল, “শুনছেন! আমাকে একটু সাহায্য করবেন?”

ডাক শুনে লোকটা তার দিকে তাকাল।

এত দূর থেকেও হরির মনে হল, ঘরের নীল আলোটা যেন ওর দু'খানা উজ্জ্বল নীল চোখ থেকেই বেরিয়ে আসছে। এমন সুন্দর চোখ সে কখনও দ্যাখেনি।

লোকটা কুয়োর ভিতর থেকে গমগমে গলায় বলল, "কী চাও? এখন আমাকে বিরক্ত কোরো না। আমি বাইবেল পড়ছি।"

"আমি গ্রিন ভ্যালিতে যাব। ভুল পথে এসে পড়েছি এখানে। আমার খুব বিপদ।"

লোকটা রোগা হাতে নিজের সাদা চুল মুঠো করে চেপে ধরে বলল, "কেন যে বিরক্ত করো আমায়। যে পথে এসেছ সেইপথে ফিরে যাও। কুড়ি পা হাঁটবার পর ডান দিকে ঘুরে যেও। ঠিক কুড়ি পা, গুনতে যেন ভুল না হয়। দরজাটা টেনে দাও। বিরক্ত কোরো না।"

লোকটা একটু রাগী ঠিকই। কিন্তু খারাপ নয়। পটলদা নিশ্চয়ই চিনবে। পরে জেনে নিলেই হবে।

হরি দরজাটা টেনে দিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠিক কুড়ি পা হাঁটল, তারপর ডান দিকে ফিরল।

আশ্চর্যের বিষয়, ডান দিকে দশ পাও হাঁটতে হল না, সে পৌঁছে গেল সিঁড়ির গোড়ায়। চটপট সিঁড়ি বেয়ে উঠে সে এসে দাঁড়াল ছবির পিছনে। তারপর নিঃশব্দে ছবিটা সামান্য সরিয়ে নীচে তাকাতেই সে নিজের ঘরখানা দেখতে পেল।

ঘরে আলো জ্বালানোই ছিল। ছবির নীচে টেবিলের ওপর চেয়ার তেমনি দাঁড় করানো। আর টেবিলের সামনেই সেই দানবের মতো লোকটা দাঁড়িয়ে হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে। চোখ দুটো বিস্ময়ে গোল।

হরি একটু সরে গেল ভিতর দিকে। অপেক্ষা করতে লাগল।

লোকটা কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সন্তর্পণে টেবিলের ওপর উঠল। তারপর চেয়ারের ওপরে। হাত বাড়িয়ে ছবিটাকে নাড়াবার চেষ্টা করল। বল বিয়ারিং-এর প্যানেলে ছবিটা নিঃশব্দে পাশের দিকে সরে যেতে লাগল।

হরি এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। হাতের টর্চটা বাগিয়ে ধরাই ছিল তার। হামাগুড়ি দিয়ে বসে টর্চটা দিয়ে সে প্রচণ্ড জোরে লোকটার মাথায় মারল।

লোকটা মাথাটা চেপে ধরল, কিন্তু একটা চাপা গর্জন ছাড়া তেমন কোনও শব্দ করল না।

আতঙ্কিত হরি টর্চটা আবার তুলল মারার জন্য। কিন্তু সেই সুযোগ হল।লোকটা বিদ্যুৎ-বেগে হাত বাড়িয়ে টর্চসুষ্ঠু তার হাতটা চেপে ধরল।

তারপরই হুড়মুড় করে টেবিল, চেয়ার, হরি এবং লোকটা ছয়ছত্রখান হয়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

চোট যে খুব বেশি লাগল তা নয়। হরি পড়েছিল লোকটার ওপর। পড়েই সে লাফ দিয়ে উঠে লাঠিটা নেওয়ার জন্য যাচ্ছিল।

লোকটা বাহাদুর বটে, ওভাবে পড়ে গিয়েও দমেনি। শোওয়া অবস্থাতেই একটা ল্যাং মেরে ফেলে দিল হরিকে।

তারপর দুজনেই দুটো ক্রুদ্ধ বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল দু’জনের ওপর।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হরি বুঝল, এর সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। এর গায়ে হাতির মতো জোর।

“জগুরাম!” বলে একবার চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করল হরি। কিন্তু অস্ফুট চিৎকারটা গলা দিয়ে বেরোবার আগেই লোকটা তার মুখে একটা প্রচণ্ড ঘুসি মারল।

ঘুসিটা খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে মেঝের ওপর পড়ে গেল হরি। তারপর আর জ্ঞান রইল না।

৮. ওদিকে কুসুমকুঞ্জের একতলার

ওদিকে কুসুমকুঞ্জের একতলার বাইরের ঘরে পটল দাস ভয়ে আর শীতে গায়ের আলোয়ানটা ভাল করে জড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিল। তাকে ঘিরে মোট ছ'জন লোক। আর-একটা লোক গেছে হরিকে ধরে আনতে। এই ছ'জনের মধ্যে তিনজনের অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। একজনের বাঁ চোখ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। একটা ভেজা রুমাল চোখে চাপা দিয়ে সে গোঙানির শব্দ করছে বসে বসে। আর একজন ডান হাতখানা ভেঙেছে। গদাধর তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে আর লোকটা যাচ্ছেতাই ভাষায় পটল দাসের উদ্দেশে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে নাগাড়ে। তৃতীয় জনের কী হয়েছে বলা মুশকিল। তবে সে লম্বা হয়ে পড়ে আছে একধারে, চেতনা নেই বললেই হয়। পটল দাসের যতদূর মনে আছে, এই লোকটার মাথায় সে একটু তবলা বাজিয়ে দিয়েছিল। তবে পটল দাসের গাঁটওয়ালা বুড়ো আঙুলগুলোর বোল আলাদা, মাথার মধ্যে কত কী গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে কে জানে।

পটল হিসেব কষে দেখল, এখন বলতে গেলে তার পাহারাদার দু'জন হরিকে ধরে আনতে গেছে। তাকে বাদ দিলে এদের দলের আরও দু'জন আছে বটে, তবে তারা এখন বাইরের দিকটা পাহারা দিচ্ছে।

পটল দাসকে কাঁপতে দেখে বেঁটেটা বলল, “খুব শীত করছে বুঝি?”

“আজ্ঞে। খুব।”

“একটু পরেই গা গরম হয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না।”

“আজ্ঞে তা বেশ বুঝতে পারছি। তবে খামোখাই পাপের ভাগী হচ্ছেন, আমি তেমন কিছু জানি না।”

"আমরা মেলা পাপের ভাগী হয়েই আছি। আর দু' একটা পাপ বাড়লে তেমন ক্ষতি হবে না। তবে যদি পেট খোলসা করে সব বলে দাও তা হলে আর পাপটা আমাদের করতে হয় না।"

"তা বটে। কিন্তু কথার আছেই বা কী! ওই হরি ছোঁড়ার বড় গল্প শোনার নেশা। কেবল আমাকে গল্প বলার জন্য যন্ত্রণা করে। তাই বানিয়ে বানিয়ে কী সব যেন বলছিলুম। আর সেই কথাই গদাধরভায়া বাইরে থেকে শুনে ভাবলে আমি বোধহয় গোপন কথা সব ফাঁস করছি।"

"তা আমাদের সেই বানানো গল্পটাই বলল না। শুনি একটু।"

"শুনবেন?" বলে গলা-খাঁকারি দিয়ে পটল দাস কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ কী একটু শুনে চমকে উঠে বলল, "ও রাবা, শব্দ কিসের?"

শব্দটা এবার সকলেই শুনতে পেল। খুব কাছেপিঠে, একেবারে ঘরের মধ্যেই একট চাপা 'ফোঁস!'

এ শব্দ সকলেরই চেনা। মোমের আলোয় মস্ত ঘরটার সিকিভাগও দেখা যাচ্ছে না। আসবাবপত্র, আনাচকানাচ সবই অন্ধকারে ডুবে আছে। এর মধ্যে সাপটা কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে কে জানে!

বেঁটে লোকটা বিদ্যুৎ-গতিতে ভোজালিটা বের করে বলে উঠল, "সাপ!"

যে লোকটা এতক্ষণ মূর্ছা গিয়ে পড়েছিল, সেই সবার আগে লাফিয়ে উঠে বলল, "বাপ রে বাপ!"।

চোখের পলকে বাকিরাও গায়ের ব্যথা ভুলে উঠে দাঁড়াল। এবার বেশ জোরালো শব্দ হল, "ফোঁস! ফোঁস! ফোঁস!" গায়ের আলোয়ানটা ফেলে দিয়ে পটল দাস লাফিয়ে উঠে বলল, "ওরে বাবা রে! গেছি রে! আলোয়ানের মধ্যে ঢুকেছে রে বাপ!"

মুহূর্তে একটা হট্টগোল পাকিয়ে উঠল। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি।

পটল দাস আলোয়ানটা তুলে ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল, “ওই যে, ওই যে! ”

সঙ্গে-সঙ্গে সাপের তীব্র শিসে ঘর ভরে গেল। বেঁটে আর তার দলবল পড়ি-কি-মরি করে ছুটল বারান্দায়।

পটল দাস খুবই ধীরস্থির ভঙ্গিতে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে হুড়কো তুলে দিল। মোমটা এক ছুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে সে অন্য পাশে ঘরের আর একটা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারেই হাতড়ে একদম তলার চৌকাঠে খুব ছোট্ট একটা পেরেকের মতো বস্তুতে চাপ দিয়ে দরজাটা ঠেলল। খুব সামান্য একটু ফাঁক হল পাল্লা দুটো। পটল দাস সেই ফাঁকের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে ভিতরে খুব সরু একটা ঝুলন্ত সুতোয় টান দিতেই পাল্লা সম্পূর্ণ খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে পাল্লাটা বন্ধ করে সুতো ফের টেনে দিল পটল।

ওপাশে তখন ধুন্ধুমার ধাক্কা পড়ছে বাইরের দরজায়। চালাকিটা বোধহয় এতক্ষণে ধরতে পেরে গেছে বাছারা। বেচারাদের জন্য একটু দুঃখও হচ্ছিল পটলের। দুধের বাছারা, সবে এই লাইনে এসেছে, এখনও তেমন বুদ্ধি পাকেনি, কান তৈরি হয়নি, চোখের নজর জোরালো হয়নি। ওরা কি আর এইসব টোটকা চালাকি ধরতে শিখেছে। সাপের শিস শুনে বাছাদের ধাত ছাড়বার জোগাড়। পটলের ভারী ইচ্ছে করছিল, ওদের কোলের কাছে বসিয়ে আদর করে সব শিখিয়ে দেয়। সাপের ডাক, বাঘের ডাক, শেয়ালের ডাক, ঝিঁঝির শব্দ। দুনিয়ায় এখনও কত কী শেখার আছে। এদেরও একটু শেখাতে ইচ্ছে করছিল তার। তবে তার ঢের সময় পাওয়া যাবে। আগে একবার হরি ছোঁড়াটার তল্লাশ নিতে হয়। ওদিকে খিচুড়িটাও বোধহয় ঠাণ্ডা মেরে গেল। কী আর করা!

পটল দাস কোনওদিন টর্চ ব্যবহার করে না। ওসবের দরকারও হয় না। সাহেবপাড়ার বাড়িগুলোর অন্ধিসন্ধি তার জানা। সে অন্ধকারেই ঘরটা পেরিয়ে পাশের দরদালানের

দিককার দরজা আবার কৌশল করে খুলে ফেলল। তারপর দরদালান পার হয়ে একটা সরুমতো প্যাসেজে ঢুকে সে দাঁড়াল। প্যাসেজটা আড়াই-তিন ফুটের বেশি চওড়া নয়।

একটু দাঁড়িয়ে দম নিয়ে নিল পটল। এবার কাজটা শক্ত। পটল দাসের কাছে শক্ত, কিন্তু অন্যদের কাছে অসম্ভব।

পটল দাস দু'দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়াল দুটো ধরল। তারপর স্রেফ হাত আর পায়ের ভর- এ তরতর করে উঠে যেতে লাগল ওপর দিকে। হাতের ভর দিয়ে পা ছাড়ে, পায়ে ভর রেখে হাত ছাড়ে। চাড় দিয়ে একবারে হাতখানেক করে ওপরে উঠে যায়।

প্রায় বারো-চোদ্দ ফুট উঁচুতে একটা অয়েলপেন্টিং টাঙানো। পটল দাস সেটার কাছ বরাবর পৌঁছে ছবিটা সরিয়ে ছোট্ট একটা গর্তের মধ্যে টিকটিকির মত সেঁধিয়ে গিয়ে ছবিটা ফের টেনে দিল।

বয়সটা বেশ হয়েছে। এইটুকু উঠতেই আজকাল বেশ হাঁফ ধরে যায়। আর হুডযুদ্ধুও তো আজ কম হয়নি। ব্যাটারা কম ডলাইমলাই করেছে নাকি তাকে? তবে কিনা পাকা হাড়, ছোঁড়াগুলোর মারের হাতও তেমন তৈরি হয়নি, তাই এখনও পটল দাস খাড়া আছে। ভগবানেরই লীলা!

পটল গর্তে ঢুকে একটু জিরোল।

চোখ বুজে বুক ভরে দম নিয়ে আর ছেড়ে পটল দাস আপনমনেই একটু হাসল। হরি ছোঁড়াকে সুড়ঙ্গের পথ বাতলানো ঠিক হয়নি। ছোঁড়াটা নির্ঘাত ছবি সরিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে বেমক্কা ঘুরতে ঘুরতে এবাড়িতে চলে এসেছিল।

পটল সময়মতো ' প্যালা! প্যালা!' করে না চেঁচালে একটা কেলেঙ্কারি হতে পারত। ছোঁড়াটা যে ছবির পিছনে দাঁড়িয়ে ঘরের সব কাণ্ড দেখছিল তাতে পটলের সন্দেহ নেই। ঘাবড়ে গিয়ে শব্দসাড়া দিয়ে ফেলতে পারত, নাকে ধুলো ঢুকে হেঁচে ফেলতে পারত, বা

কেসেই ফেলল হয়তো। এমনকী দীর্ঘশ্বাস ফেলাটাও অসম্ভব ছিল না। পটল চেঁচানোয় ছোঁড়াটা বুদ্ধি করে পালিয়েছে। ছোঁড়া ধরা পড়লে সুড়ঙ্গের কথাটা জানাজানি হয়ে যেত।

খানিকটা জিরিয়ে পটল উঠল। আরও একটু জিরোলে হত, কিন্তু তার কি উপায় আছে! খিচুড়িটা ঠাণ্ডা মেরে গেলেই গোবর। ঠাণ্ডা খিচুড়ি পটল দাস দু'চোখে দেখতে পারে না। আর প্যালার মা'ও তেমন ভালমানুষের মেয়ে নয় যে, ঠাণ্ডা খিচুড়ি ফের গরম করতে উনুন ধরাবে।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে পটল দাস দেওয়ালের একটা ঘুলঘুলিতে চোখ রাখল। একরত্তি ঘুলঘুলি। ছানিপড়া চোখে বাইরের কুয়াশা আর অন্ধকারে তেমন কিছু ঠাহরও হয় না। এবার ঠাণ্ডাটাও পড়েছে বাপ। হাড় একেবারে ফালি হয়ে গেল।

গ্রিন ভ্যালির দিকটায় একটা টর্চের আলো দেখা গেল না? হ্যাঁ, তাই বটে। জ্বলছে, নিবছে। একটা লম্বাপানা লোক কী একটা বস্তু ঘাড়ে করে যেন ভাঙা পাঁচিলটা বেয়ে নামল।

সর্বনাশ! হরি ছোঁড়াটা ধরাই পড়ল নাকি? কেলেঙ্কারি আর কাকে বলে! আনাড়ি ছেলেমানুষ, একটা-দুটো কোঁতকা খেলেই ভ্যাড়ভ্যাড় করে সব বলে দেবে।

নাঃ, কপালটাই খারাপ। পটল দাস আপনমনেই মাথা নাড়ল।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটা বড় ঘুলঘুলির সামনে থামল। কোনওক্রমে একটা বড় বেড়াল গলে যেতে পারে এমন একটা ফোকর।

'তা পটল দাস কুকুর বেড়ালের বেশিই বা কী? পটল খুব অভিমানভরে কথাটা বিড়বিড় করে বলল। তারপর দমটা ছেড়ে শরীরটা নরম করে পটল দাস সেই ঘুলঘুলি দিয়ে ঠিক একটা বেড়ালের মতোই গলে গেল। চোদ্দ ফুট নীচে জমি। তা হোক। পটল দাস হাওয়ায় ভর দিয়ে পাখির মতোই নেমে এল নীচে।

লম্বা লোকটা হরিকে কাঁধে নিয়ে অর্ধেক বাগান পেরিয়ে চলে এসেছে। আর দেরি করাটা ঠিক হবে না।

পটল দাস জোর কদমে কোনাকুনি গিয়ে লোকটার একখানা হাত ধরে ফেলল। তারপর অমায়িক গলায় বলল, "দেশলাই আছে বাপু তোমার কাছে? একটা বিড়ি খাব!"

লোকটা পটলকে দেখে এত অবাক হল যে তার কাঁধ থেকে হরি গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে, ধপাস করে।

"তুই! তোকে কে ছেড়েছে?"

পটল একগাল হেসে বলল, "ছাড়বে কী গো? ধরল কখন? আর ধরে হবেটাই বা কী? আমার পেটে যে কথা থাকে না তা সবাই জানে। দুধের বাছারা সব কী যেন খুঁজছে, কবর না কী, ছাইমাটি। তা বাপু, আমার কবরটবর শ্মশানটশানে বড় ভয়। আমি ওসব জানিও না, চিনিও না। তা বাপু, আছে নাকি দেশলাই?"

লোকটার বিস্ময় কেটে এবার হিংস্র রাগ উঠল। বলল, "তোর অনেক চালাকি দেখেছি। ফের কোনও চালাকি করেই বেরিয়ে এসেছিস! কিন্তু এবার তোর খেলা শেষ।"

এই বলে লোকটা তার প্রকাণ্ড দুটো হাতে পটল দাসকে লৌহ-ভীম চূর্ণ করার মতো শক্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে গেল।

পটল একটু সরে দাঁড়াল শুধু।

লোকটা দুহাতে জাপটে ধরতে গিয়ে খানিকটা বাতাস ছাড়া আর কিছু পেল না। কিন্তু এবার আর অবাক হওয়ার অবকাশটুকুও তাকে দিল না পটল। হাত বাড়িয়ে তার গাঁটওলা আঙুল দিয়ে খুব মৃদু একটু তবলা বাজিয়ে দিল তার মাথায়।

লোকটা হাঁ করা অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল দড়াম করে। পড়ে আর নড়ল না।

পটল অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা লোকটার দিকে চেয়ে ভারী বিরক্তির

গলায় বলল, “দ্যাখো কাণ্ড, একেবারে ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেল! এই বুড়ো আঙুলে কি আর সেই ক্ষমতা আছে রে বাপ, তবু এইটুকুই সইতে পারলি না! ছ্যা ছ্যা। তোরা কী রে?”

লোকটাকে ছেড়ে পটল এবার হরির দিকে তাকাল। কাঁধ থেকে পড়েই হোক, আর হিম লেগেই হোক, হরির জ্ঞান ফিরে এসেছে। ডোম্বলের মতো চোখ পিটপিট করে চাইছিল। পটলকে দেখে উঠে বসে বলল, “ওঃ, মাথাটা ভীষণ ঝিমঝিম করছে।”

“মাথাটা যে এখনও ঘাড়ের ওপর আছে তাই ঢের। কে তোকে সুড়ঙ্গে ঢুকতে বলেছিল শুনি!”

মুখে হাত বোলাতে বোলাতে হরি একটু অবাক হয়ে পটল দাসের দিকে চেয়ে বলল, “ওরা তোমাকে ছেড়ে দিল যে বড়।”

“ছেড়ে দেবে না তো কী? ভাল লোকেদের ওইটেই সুবিধে, ঘোর পাপীরাও তাদের খাতির করে। নে, এখন ওঠ। এ-জায়গাটা এবার তোকে ছাড়তে হচ্ছে।”

“কোথায় যাব?”

পটল দাস মাথা নেড়ে বলল, “সে কি আর ভাল জায়গা রে? প্যালার মা মহাদজ্জাল, উঠতে বসতে কথা শোনাবে। তার ওপর গরিবের ঘর,

সেখানে নুন-পান্তার জোগাড়ই ভাল করে হয় না। কিন্তু এখানে তো আর টিকতে পারবি না। গ্রিন ভ্যালি বেশ বিপদের জায়গা হয়ে পড়েছে।”

হরি উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, “কিন্তু এই লোকটা সুড়ঙ্গের কথা জেনে ফেলেছে। একে ফেলে গেলে সব ফাঁস করে দেবে।”

পটল খিঁচিয়ে উঠে বলল, “খুব কেরানি দেখিয়েছ। পাজি ছোঁড়া কোথাকার! তোর জন্যই তো সব ফাঁস হল। এখন কী করা যাবে, এ তো মহা মুশকিল হল।”

হরি লজ্জিত হয়ে বলল, “কিন্তু এ-লোকটার একটা ব্যবস্থা না করে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। আমি বলি কি, একে হাত-পা বেঁধে সুড়ঙ্গের মধ্যে ভরে রাখলে কেমন হয়।”

“মরে যাবে। শেষে মানুষ খুনের মামলায় পড়বি।”

“তা বটে। তা হলে?”

পটল দাস কিছুক্ষণ মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবল। তারপর বলল, “খিদেটাও পেয়েছে বেজায়। ওদিকে খিচুড়িটা এতক্ষণে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল। তোকে বলেই বলছি। কথাটা পাঁচকান করিস না।”

কৌতূহলী হয়ে হরি বলল, “কী কথা পটলদা?”

পটল গলাটা নামিয়ে বলল, “ঠাণ্ডা খিচুড়ি কখনও খাস না। ঠাণ্ডা হলে খিচুড়িতে আর গোবরে তফাত নেই।”

“কিন্তু আমি তো বাসী খিচুড়ি খেতে খুব ভালবাসি।”

“সে আমিও বাসি।”

“তা হলে?”

“সেইটেই তো হয়েছে মুশকিল। বুড়ো বয়সে কী যে ভালবাসি আর কী যে ভালবাসি না, সেইটেই ঠাহর পাই না। এই যে এই লম্বা হয়ে পড়ে আরামে জিরেন নিচ্ছে লোকটা, একে নিয়েই বা কী করা যায় কিছু মাথায় খেলছে না। বুড়ো হলে মাথাটারও বয়স বাড়ে কিনা। আপাতত একে চব্বিশ ঘণ্টার মতো ঘুম পাড়িয়ে রাখি। তারপর দেখা যাবে।”

বলে পটল দাস ট্যাঁক থেকে একটা ছোট শিশি বের করল। শিশিটা খুলে লোকটার নাকের কাছে ধরল একটু। ফের ছিপি বন্ধ করে ট্যাঁকে রেখে বলল, "এবার চলল, ওই ঝোঁপটার মধ্যে ঠেসে দিই লোকটাকে।"

হরি চোখ গোল করে কাণ্ডটা দেখছিল। বলল, "ওটা কী শোঁকালে?"

"এও এক টোটকা রে বাপ। চব্বিশ ঘণ্টা টানা ঘুমাবে এখন বাছাধন। গায়ের ওপর দিয়ে মোষে হেঁটে গেলেও টের পাবে না। একটু বেশি শুকিয়ে দিলেই অক্কা। এক নাগা সাধু দিয়েছিল। কিন্তু আর দেরি করা ঠিক হবে না। এদের আসল সর্দার এসে পড়তে দেরি নেই। সে এদের মতো আনাড়ি নয়।"

দু'জনে মিলে লোকটাকে ধরাধরি করে একটা ঘন ঝোঁপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর হরি জিজ্ঞেস করল, "আসল সর্দারটি আবার কে?"

"তা আমি কী জানি।"

"এই যে বললে, সে আনাড়ি নয়। তার মানে তাকে তুমি চেনো।"

"ফুলকপির পোড়ের ভাজা দিয়ে খিচুড়ি তোমার কেমন লাগে? সঙ্গে যদি বেশ মচমচে আলুর চপও থাকে?"

"ভালই। কিন্তু আমার ঘরের সুড়ঙ্গের গর্তটা খোলা রয়েছে সে খেয়াল আছে? আর এই যে লোকটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে, এর স্যাঙাতটা কি একে খুঁজতে আমার ঘরে গিয়ে হানা দেবে না? সুড়ঙ্গটা তো হাঁহাঁ করছে।"

পটল দাস নির্বিকার মুখে বলল, "ও কি আর লুকনো যাবে রে ভাই? যে সুড়ঙ্গের এতগুলো মুখ চারদিকে ছড়ানো রয়েছে তা কি আর বেশিক্ষণ লুকনো যায়? আর এরাও তো ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। খুঁজে বের করতই।"

"তা হলে কী হবে?"

"কী আর হবে? সুড়ঙ্গে আমি নিত্যিদিন ঘুরে বেড়াই। কিছুই নেই। ওরা যদি সুড়ঙ্গে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে চায় তো মরুকগে। তাতে বরং আমাদের খানিকটা সময় বাঁচবে। খিচুড়িটাকে আর ঠাণ্ডা হতে দেওয়া ঠিক হবে না।"

হরি একটু চিন্তিতভাবে বলল, "সে অবশ্য ঠিক কথা। গোলঘরের সেই লোকটাও দেখলাম সুড়ঙ্গটা বেশ চেনে। আমি জিজ্ঞেস করতেই পথ দেখিয়ে দিল।"

পটল দাস একটা হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করল হঠাৎ। তারপর চাপা গর্জনের মতো স্বরে বলল, "কী বললে? গোলঘর!"

হরি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। কুয়োর মতো গোল আর অনেকটা গভীর। নীল আলো জ্বলছিল ঘরে। একটা কাঠের বাক্স..."

কথা শেষ করার আগেই তার মুখে একটা থাবড়া এসে পড়ল। পটল দাস হিংস্র একটা গর্জন ছেড়ে বলল, "চোপ!"

হরি কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পটলের এই আকস্মিক আচরণে। থাবড়ায় তার ঠোঁট কেটে রক্তের নোনা স্বাদ ঠেকছিল জিভে। সে অবাক হয়ে বলল, "ওরকম করছ কেন?"

পটল দাসের চেহারাটা অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছিল হরি। চোখ দুটোয় জ্বলজ্বলে আগুন। খুনির গলায় সে বলল, "মিথ্যে কথা। তুমি বানিয়ে বলছ। গত ত্রিশ বছর আমি সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি। আনাচকানাচ কিছু বাকি নেই। আমি কখনও ওরকম ঘর দেখতে পাইনি। তুমি পেলে কী ভাবে?"

হরির গা কেমন যেন শিউরে উঠল ভয়ে। শরীরটা হিম। সে আমতা-আমতা করে বলল, "হঠাৎ আমার পা পিছলে গিয়েছিল। পড়ে গড়িয়ে গেলাম অনেকটা ঢালুতে। একটা কাঠের চৌকো দরজায়..."

পটল দাস আচমকাই আবার একটা থাবড়া মারল তার মুখে। তারপর তেমনই হিংস্র গলায় বলল, "তা হলে তোমাকে এখনই নিকেশ করা দরকার। এখনই। নইলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে..."

বলতে বলতে দুটো হাত সাঁড়াশির মতো হরির গলা চেপে ধরল।

হরি এত অবাক হয়ে গেল যে, বাধাটুকু পর্যন্ত দিতে পারল না। দমবন্ধ হয়ে চোখ কপালে উঠল তার। কপালে চিনচিন করে ঘাম ফুটে উঠতে লাগল। জিভ বেরিয়ে এল।

মরেই যাচ্ছিল হরি। মনে-মনে সে বুঝতে পারছিল, বাঁচবার আর কোনও আশাই তার নেই। কিন্তু পটল দাস তো মজার লোক। চোর হলেও মানুষটা ভাল। তার সঙ্গে এত ভাব। তবু তাকে পটল দাসের হাতেই মরতে হচ্ছে?

আচমকাই মাটির গভীর থেকে এক গুড়গুড় ধ্বনি উঠে এল। দ্রুত ধাবমান এক ধ্বনি।

নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারকে চমকে দিয়ে এক তেজীয়ান ঘোড়া তীব্র হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। তারপরই ঝড়ের গতিতে সাদা একটা ঘোড়া অন্ধকারে বিদ্যুচ্চমকের মতো ছুটে এল তাদের দিকে।

কী যে হল কিছুই বুঝতে পারল না হরি। তার হঠাৎ গলার চাপটা সরে যেতেই সে উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। তারপর কাসতে লাগল। কিছুক্ষণ সে বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো বসে বসেই শুনতে পেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর ধীরে-ধীরে ধাতস্থ হয়ে সে চারদিকে চেয়ে দেখল। না, ঘোড়া অদৃশ্য হয়েছে। তারপর পটল দাসও কোথাও নেই। স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে।

কে তাকে বাঁচাল? আবার পাগলা-সাহেব?

হরি উঠে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে এসে ভাঙা পাঁচিল টপকে বাগান পার হয়ে নিজের ঘরে এসে ক্লান্তভাবে বসে পড়ল বিছানায়। মাথার ভিতর বড়ই ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল।

খানিকটা জিরিয়ে সে উঠল। দেওয়ালের গর্তটা বন্ধ করতে হবে। চেয়ার-টেবিল জায়গাতে রাখতে হবে।

ঝুলঝাড়ুনিটাকে নিয়ে ছবিটা সরাতে গিয়ে সে অবাক হয়ে দেখল, ছবিটা নিখুঁতভাবে গর্তটা ঢেকে টাঙানো রয়েছে। তার চেয়ার-টেবিল জায়গামতো সাজিয়ে রাখা। এতক্ষণ উত্তেজনার বশে সে খেয়াল করেনি।

কে করল? কখন করল?

.

শরীরটা বড়ই ক্লান্ত লাগছিল হরির। সে খানিকটা জল খেয়ে শুয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

সকালে ঘুম ভাঙল ঝুমরির ডাকে। তার জলখাবার নিয়ে এসেছে।

ঝুমরি কথা প্রায় বলেই না। কিন্তু আজ হরি দরজা খুলবার পর ঝুমরি খুব অবাক হয়ে হরির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঘরে ঢুকে থালাটা টেবিলে রেখে তার দিকে ফিরে বলল, “কে তোমার গায়ে হাত দিয়েছে? তার নাম বলো। জগুরাম গিয়ে তার মুণ্ডু ছিঁড়ে আনবে।”

হরি শশব্যস্ত হয়ে বলল, “কেউ মারেনি, আমি পড়ে গিয়েছিলাম।”

“ঝুট বাত। সাচ বোলো, ম্যায় খুদ উস গুণ্ডেকো সিধা বনায়েঙ্গ।” এই বলে ঝুমরি তার আঁচল কোমরে জড়াল। তার চোখমুখ একেবারে ধকধক করছে।

ঝুমরি যে তার জন্য এতটা উতলা হবে, তা হরি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তবে সে মাথা নেড়ে দৃঢ় গলায় বলল, “আমাকে কেউ মারেনি, বিশ্বাস করো। আমি বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম, তখন একটু চোট লেগেছে মুখে।”

ঝুমরি বিশ্বাস করল কি না কে জানে, তবে চলে গেল। একটু বাদেই জগুরাম এসে ঘরের মাঝখানটায় তার বিশাল চেহারা নিয়ে খাড়া হল। বলল, “ঝুমরি আমাকে খুব বকছে, অমি তোমার দেখভাল ঠিকমতো করছি না বলে। তা কে তোমার দুশমন বলো, তাকে লাঠিপেটা করে দিয়ে আসি।”

হরি জগুরামের ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল। তারপর বলল, “তোমাকে ভাবতে হবে না জগুরাম। এখানে আমার কয়েকজন ভাল বন্ধু আছে। কিন্তু একটা কথা। কিছু বদমাশ লোক কুসুমকুঞ্জ আর গ্রিন ভ্যালিতে আনাগোনা করছে। তুমি একটু নজর রেখো।”

“ঠিক আছে।” বলে জগুরাম চলে গেল।

হরি খেয়েদেয়ে স্কুলে গেল আজও। তিনদিন ধরে স্কুলে, রাস্তায়, বাড়িতে বারবার মারধর খেয়ে এবং কাল রাতে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েও সে দমে যায়নি। রহস্য ভেদ করার তীব্র একটা কৌতূহলই তাকে চাঙ্গা রেখেছে।

ফার্স্ট পিরিয়ডের পরই বেয়ারা একটা চিরকুট নিয়ে ক্লাসে এল। হেডমাস্টারমশাই হরিবন্ধুকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

দুরুদুরু বুকে হরিবন্ধু বেয়ারার পিছন-পিছন বেরিয়ে এল ক্লাস থেকে।

হেডস্যার যেমন গম্ভীর, তেমনি ব্যক্তিত্ববান রাশভারী মানুষ। আজ তাঁকে একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

হরি তাঁর অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকবার পর তিনি হরির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হরিকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে পেল।

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর তিনি খুব নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

হরি মাথা নেড়ে বলল, "না স্যার।"

হেডস্যার কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে খুব ধীরে-ধীরে বললেন, "আমার কর্তব্য প্রত্যেকটি ছাত্রের দিকে নজর রাখা, প্রত্যেকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, প্রত্যেকের উন্নতিসাধনে সাহায্য করা। সবসময়ে আমি তা পেরে উঠি না। তুমি হয়তো জানো, এটা ভাল ছেলেদের স্কুল নয়। রিফর্মেটরি স্কুল হিসেবেই এটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু যতটা করা উচিত, ততটা আমরা পেরে উঠি না। অনেক আজেবাজে ছেলে ছাত্র সেজে এখানে ঢোকে। তারাই নানারকম খারাপ কাজও করে। আমি খবর পেয়েছি, এই স্কুলের কয়েকটা ছেলে তোমার ওপর চড়াও হয়েছিল। তুমি কি তাদের নাম বলতে পারবে?"

হরি মাথা নিচু করে রইল। সহপাঠীরা যত খারাপই হোক, তাদের নাম বলে দেওয়াটা হরি একরকম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করে।

হেডস্যার মৃদুস্বরে বললেন, "বলতে ভয় পাচ্ছ?"

"ঠিক তা নয় স্যার।"

"বুঝেছি। ইটস এ গুড জেশ্চার। কিন্তু যাদের বাঁচাতে তুমি মহত্ত্ব দেখাচ্ছ তারা বোধহয় তত ভাল নয়। আর-একটা কথা...।"

"বলুন স্যার।"

"এখানে পাগলা-সাহেবের নামে একটা কিংবদন্তি চালু আছে। তুমি কি তা শুনেছ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি যদিও ওরকম কিংবদন্তিতে খুব আস্থাবান নই, তবে কোনও সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়াটাও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয়। আমি এখানে অনেকদিন আছি, কিন্তু কখনও পাগলা-সাহেবকে দেখিনি। তবে অনেকে দেখেছে বলে শোনা যায়। শুনেছি, তার কবর খুঁজতে মোতিগঞ্জে কিছু পাজি লোক হানা দিয়েছে। সত্যি-মিথ্যে জানি না,..."

হেডস্যারকে কথা শেষ করতে না দিয়েই উত্তেজিত হরি বলে উঠল, "সত্যি স্যার।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ স্যার। আর পাগলা-সাহেবের কিংবদন্তিও সত্যি। আমি নিজে চোখে দেখেছি।"

হেডস্যার অবাক হয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "খুবই আশ্চর্যের কথা। এবার তোমাকে একটা ছড়া বলি, দ্যাখো তো, কখনও শুনেছ কি না। হেঁটেও নয়, ছুটেও নয়, সাপের মতো। দূরেও নয়, কাছেও নয়, গভীর কত। আলোও নয়, অমাও নয়, যায় যে দেখা। আজও নয়, কালও নয়, ভাগ্যে লেখা।"

হরি মাথা নেড়ে বলল, "না স্যার, এ-ছড়া কখনও শুনিনি।"

"ছড়াটা খুবই অদ্ভুত এবং মোতিগঞ্জের অনেকেই জানে। ছড়াটা নাকি সাঙ্কেতিক। তবে এই সঙ্কেতের অর্থ আমি কখনও ভেদ করতে পারিনি।

তুমি পাগলা-সাহেবকে দেখেছ শুনেই ছড়াটা তোমাকে বললাম।"

"এ-ছড়ার সঙ্গে কি পাগলা-সাহেবের সম্পর্ক আছে স্যার?" "তাই তো শুনি।"

হরি বিড়বিড় করে ছড়াটা নির্ভুল আওড়াল, "হেঁটেও নয়, ছুটেও নয়, সাপের মতো। দূরেও নয়, কাছেও নয়, গভীর কত। আলোও নয়, অমাও নয়, যায় যে দেখা। আজও নয়, কালও নয়, ভাগ্যে লেখা।"

"বাঃ, একবার শুনেই তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে দেখছি! দুখিরামবাবু চিঠিতে জানিয়েছিলেন, তুমি খুব ডাল-হেডেড ছেলে বলে তোমার বাবার ধারণা, কিন্তু তা তো নয়। স্মৃতি এবং গ্রহণক্ষমতা খুব অদ্ভুত জিনিস। মন যেটা চায় সেটা সহজেই শেখা যায়। পড়ার জন্য পড়লে সহজে শেখা যায় না, আবার জানার আগ্রহ নিয়ে পড়লে, টপ করে শেখা হয়ে যায়। তোমার ব্রেন মোটেই খারাপ নয়। শুধু দরকার একটু আগ্রহ।"

এ-কথায় হরি লজ্জায় হেঁটমুণ্ডু হল।

হেডস্যার মৃদু গম্ভীর গলায় বললেন, "ঠিক আছে। এখন যাও। মন দিয়ে পড়াশুনো করবে, নিজের দিকে লক্ষ রাখবে। কোনও সাহায্যের দরকার হলে মাস্টারমশাইদের কাছে বলবে। তোমার আচরণে আমি খুশি হয়েছি।"

হরি আনন্দে ভাসতে ভাসতে ক্লাসে এসে বসল। গোপাল আজও ক্লাসে ছিল না। হরি চোরা চোখে লক্ষ করল, গদাধর, রাজর্ষি, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স কেউই আজ ক্লাসে নেই। না থাকরই কথা। তাদের ক্লাসে দেখলে খুবই অবাক হত হরি। তবে টুবলু এসেছে। পিছনের বেঞ্চ থেকে তাকে একবার হাত তুলে ইশারা করল।

আজ মাস্টারমশাইরাও কে জানে কেন খুবই ভাল ব্যবহার করছিলেন হরির সঙ্গে। ভূগোলস্যার ব্যোমকেশবাবু দুর্দান্ত রাগী মানুষ। তাঁর ক্লাসে হরি হোয়াংহো নদী কোথায় তা বলতে না পারায় ব্যোমকেশবাবু কিন্তু একটুও রাগ করলেন না। শুধু বললেন, "চিনের দুঃখ যেন তোমারও দুঃখের কারণ না হয়, দেখো।"

টিফিনে টুলু আর হরি একসঙ্গে বেরোল বাদাম খেতে। হরি জিজ্ঞেস করল, "গোপাল কেমন আছে টুলু?"

টুবলু মাথা নেড়ে বলল, "ভাল নেই। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে আর ভুল বকছে। বারবার তোমার নামও বলছে।"

"আমার নাম করে কী বলছে?"

"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে বলছে, 'হরি, ছেড়ো না, তুমিই পারবে।"

"তার মানে কী?"

"প্রলাপের কি মানে থাকে?"

"আর-একটা কথার জবাব দেবে টুলু? এখানকার সবাই পাগলা-সাহেবের কবর নিয়ে এত ভাবে কেন?"

"আমি অত জানি না। তবে যতদূর শুনেছি পাগলা-সাহেবের কবরটা সাধারণ কবর নয়। মাটির তলায় একটা ঘরে তার কফিন রাখা আছে। যদি কেউ সেই ঘরের বাতাস থেকে একটু শ্বাস টেনে নিয়ে আসতে পারে তা হলে তাকে আর পায় কে!"
"কী হবে তার?"
"সে রাজা হয়ে যাবে। মোতিগঞ্জের সকলেই তাই কবরটা খোঁজে। আর কিছু লোক আছে, যারা এ-গল্প বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারাও কবরটা খোঁজে ওই ক্রসটার জন্য।"

"তুমি কি সত্যিই পাগলা-সাহেবের গল্প বিশ্বাস করো?"

"করি। কাল তুমিও তো দেখলে।"
হরি মাথা নেড়ে বলল, "এ-পর্যন্ত দু'-দু'বার পাগলা-সাহেব আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমি তাঁকে অবিশ্বাস করি না, কিন্তু..."
"কিন্তু কী?"

"থাক সে কথা, পরে হবে। আমি আজ ছুটির পর গোপালকে দেখতে যাব, আমাকে নিয়ে যাবে?"

"নিশ্চয়ই।"

৯. গোপালদের পাড়াটা শহরের এক প্রান্তে

গোপালদের পাড়াটা শহরের এক প্রান্তে। একটু ঘিঞ্জি, নোংরা, গরিব পাড়া। গোপালদের বাড়িটাও বেশ পুরনো, একটু ভাঙাটাঙাও বটে। ভিতরের দিকে একখানা ঘরে গোপাল ঘোর জ্বরের মধ্যে শুয়ে ছিল। তার মা মাথায় জলপটি দিচ্ছে, পিসি আর ঠাকুমা বসে আছেন পাশে। বিভীষণ-চেহারার ঝিকু-সদার পায়চারি করছে ঘরে।

হরি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, "গোপাল কেমন আছে?"

ঝিকু-সদার তার দিকে চেয়ে থমকে গেল, বলল, "ভাল নেই, মেলা ভুল বকছে। তোমার নামই কি হরি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এসো, পাশের ঘরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।" পাশের ঘরে হরিকে একটা মোড়ায় বসিয়ে মুখোমুখি আর-একটা মোড়ায় বসে ঝিকু বলল, "কাল রাতে সুড়ঙ্গের মধ্যে তুমি কী দেখেছ? কোনও মানুষকে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে সে-কথা কে বলল?"

"পটল দাস। তার এখন মাথার ঠিক নেই।"

"হ্যাঁ, পটলদা কাল রাতে আমাকে আর-একটু হলেই মেরে ফেলেছিল।"

ঝিকু-সদার মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু বিশ্বাস করতে পারো, পটল খুনটুন কখনও করেনি, তার ধাতই সেরকম নয়। তবে কাল তোমার কথা শুনে তার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল।"

হরি একটু অবাক হয়ে বলল, "এতে মাথা বিগড়োবার কী আছে, আমি বুঝতে পারছি না। সুড়ঙ্গের অনেকগুলো মুখ। সেগুলো একটা করে ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে। তেমনি একটা ঘরে আমি লোকটাকে দেখি।"

ঝিকুর চোখ ঝলসে উঠল। চাপা গলায় সে বলল, "লোকটা দেখতে কেমন ছিল?"

"রোগা, ফর্সা, নীল চোখ।"

"সেই ঘরে কী ছিল?"

"একটা কাঠের বাক্স, একটা ডেকচেয়ার। আর তেমন কিছু নয়।" ঝিকু উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে মাথা নেড়ে বলল, "নাঃ, অসম্ভব! এ হতেই পারে না! তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

হরি অবাক হয়ে বলল, "এতে মিথ্যে কথা বলার কী আছে?"

"ওই সুড়ঙ্গের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা আমি আর পটল তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কখনও ওরকম কিছু দেখিনি। তুমি ভুল দ্যাখোনি তো!"

হরি এবার একটু হেসে বিনীতভাবে বলল, "ভুল দেখাও সম্ভব। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনারা কথাটা শুনে এরকম অবিশ্বাস করছেন কেন?"

ঝিকু অবাক হয়ে বলল, "তুমি কী দেখেছ তা কি এখনও বুঝতে পারছ? গোলঘরে নীল আলো, রোগা-ফসা একজন লোক বসে বাইবেল পড়ছে। সত্যিই বুঝতে পারছ না?"

"না। তবে এখন মনে হচ্ছে...।"

"হ্যাঁ। ঠিকই মনে হচ্ছে। সারা মোতিগঞ্জের লোক বহুকাল ধরে বহু ঘাম ঝরিয়ে, বহু মাথা খাঁটিয়ে যা বের করতে পারেনি, তুমি সেই পাগলা-সাহেবের কবর দেখেছ!"

এতক্ষণে হরির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শরীরে একটা হিম স্রোত নেমে গেল।

হরি আর বসল না। পরে আসবে বলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বাইরে টুবলু তার জন্য অপেক্ষা করছিল। হরি তাকে বলল, “তোমাকে আর আমার সঙ্গে যেতে হবে না। তুমি বাড়ি যাও।”

টুবলু একটু হেসে মাথা নেড়ে চলে গেল।

.

হরি গোপালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকদূর হনহন করে হেঁটে গেল। তারপর রাস্তা জনহীন হয়ে গেলে সে চারদিকে চেয়ে টপ করে রাস্তা থেকে নেমে মাঠ আর জঙ্গলের ঘুরপথে ফিরে আসতে লাগল গোপালের বাড়ির দিকে। সন্ধে হয়ে এসেছে। গা-ঢাকা দেওয়ার সুবিধে খুব। ঝিকু-সদারের সঙ্গে কথা বলার সময় সে একটা ঘোড়ার ডাক শুনেছে।

গোপালদের বাড়ির পিছন দিকটায় খানিকটা পোড়ো জমি। চারদিকে কাঁটা ঝোঁপ। ঝোঁপের আড়ালে একটা টিনের ঘর। হরি খুব সাবধানে কাঁটা ঝোঁপের বেড়া টপকাল।

টিনের ঘরটায় তালা দেওয়া। কিন্তু ভিতরে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। খুব সন্তর্পণে হরি দরজাটা ঠেলে একুখানি ফাঁক করল। চোখ রেখে দেখল, ভিতরে একটা সাদা ঘোড়া পা দাপিয়ে মশা তাড়াচ্ছে।

হরি একটু হাসল। কাল বিকেলে তাকে আর টুবলুকে রাজর্ষি আর তার দলের হাত থেকে যে বাঁচিয়েছিল, সে যে সাহেব নয় এবং পাগলাও নয়, তাতে সন্দেহ নেই। রং-মাখা সাদা মুখটা এক ঝলক দেখে মনে রেখেছিল হরি। আর ঝিকু-সদারের মুখে সেই মুখের আদল দেখেই তার মনে হয়েছিল, পাগলা-সাহেব আসলে..

হরি ভাবতে ভাবতে নিজের বাসায় ফিরে এল।

ঝুমরি ফের একটা ছাতুর তাল দিয়ে গেল। আনমনে হরি সেটা যখন খাচ্ছিল তখন দরজার কাছে খুব বিনীতভাবে কে যেন কাসল একটু।

হরি চেয়ে দেখল, পটল দাস। চোখে মিটমিটে দৃষ্টি, মুখে অপরাধী হাসি।

হরি মুখটা গম্ভীর রেখে বলল, "কী খবর?"

পটল ঘরে ঢুকে উবু হয়ে হঠাৎ হরির দু'খানা পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলল, "ব্রাহ্মণ মানুষ তুমি, বয়সে ছোট তো কী! আমায় মাফ করে দাও।"

হরি তাড়াতাড়ি পা টেনে নিয়ে বলল, "ওটা কী হচ্ছে!"

পটল দাস তার চাঁদরের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বলল, "আমার মাথায় কাল শয়তানে ভর করেছিল। তোমার গলা টিপে ধরেছিলুম। কিন্তু যে-কোনও দিব্যি করে বলতে পারি, তোমাকে মারতুম না। ইচ্ছে ছিল, অজ্ঞান করে ফেলে কাঁধে করে নিয়ে তোমাকে গুম করে রাখব।"

"কেন বলো তো!"

পটল দাস ভেউ-ভেউ করে কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর বলল, "বহুকাল আগে এক পাগলা-ফকির একটা অদ্ভুত কথা হাটে মাঠে বলে বেড়াত। ছুটেও নয়, হেঁটেও নয়, সাপের মতো..."

হরি বাকিটা পূরণ করে দিল, "কাছেও নয়, দূরেও নয়, গভীর কত। আলোও নয়, অমাও নয়, যায় যে দেখা। আজও নয়, কালও নয়, ভাগ্যে লেখা।"

পটল চোখ বড় বড় করে বলল, "তুমি জানো?"

"জানি। হেডমাস্টারমশাই ছড়াটার কথা আমাকে বলেছিলেন।"

পটল দাস কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে বসে থেকে ধরা গলায় বলল, "তোমার কাছে কিছু লুকোব না। পাগলা-সাহেবের ভূত ঘুরে বেড়ায় বলে লোকে বিশ্বাস করে। কিন্তু আসলে আজ অবধি আমি নিজে কখনও দেখিনি। কিন্তু..."

হরি ছাতুর শেষ দলাটা গিলে ফেলে বলল, "কিন্তু তোমরা কয়েকজন পাজি লোক পাগলা-সাহেব সেজে মাঝে-মাঝে দেখা দাও। লোকের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য।"

পটল দাস হরির মুখের দিকে চেয়ে অবাক গলায় বলল, " তা হলে তুমি ধরতে পেরেছ? বাস্তবিকই তোমার খুব বৃদ্ধি। আমি তোমাকে প্রথমটায় বোকা ঠাউরেছিলুম।"

"কিন্তু তোমরা এটা কেন করো পটলদা?"

"মোতিগঞ্জের লোকেদের ভালর জন্যই। অন্যায় করলে, পাপ করলে পাগলা-সাহেব এসে হাজির হবেন। লোকে তাই খারাপ কাজ করার আগে একটু ভাববে। বিশ্বাস করো, আমাদের খারাপ মতলব কিছু ছিল না।"

"পাগলা-সাহেব কে সাজত?"

"কখনও ঝিকু, কখনও তার ছেলে গোপাল, আমিও সেজেছি। এক রকম মজাও ছিল খেলাটায়। কিন্তু কাল রাতে..," বলে থেমে গেল পটল দাস। হাতখানা হরির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই দ্যাখো, রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।"

"কাল রাতে কী?"

"কাল রাতে যখন তোমার গলা টিপে ধরেছিলুম তখন যে-লোকটা সাদা ঘোড়ায় চেপে ছুটে এল, সে কিন্তু আমাদের কেউ নয়।"

একটু কাঁপা গলায় হরি বলল, "সে তা হলে কে পটলদা?"

পটল দাস জুলজুল করে হরির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "সেই কথাটাই জানতে এসেছিলুম তোমার কাছে। সে লোকটা কে? বুড়ো বয়স, চোখে ছানিও পড়েছে, কিন্তু তবু অন্ধকারে যেটুকু ঠাহর করতে পেরেছিলুম তা মনে করলে শরীর হিম হয়ে আসে।"

"তুমি কী দেখেছিলে?"

"একটা সাদা ঘোড়া ধেয়ে এল। তার ওপর সওয়ার এক লম্বাপানা রোগা সাহেব। চোখ দুটো জ্বলছিল ধকধক করে। সে আমাদের দিকে ছুটে এল, আমাদের ওপর দিয়েই ছুটে গেল, কিন্তু শুধু একটা ঝোড়ো বাতাস ছাড়া কিছুই টের পেলুম না। ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুট লাগালুম। হুমড়ি খেয়ে পড়লুম গিয়ে ওই ভাঙা পাঁচিলটার গায়ে। বহুকাল এরকম ভয় পাইনি।

"তারপর কী করলে?"

"কী করলুম, তা আর ঠিক মনে নেই। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলুম কিছুক্ষণ। এখনও আমার ধন্দ ভাবটা যায়নি। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, সত্যিকারের পাগলা-সাহেবও ঘোড়ায় চেপে বেরোন বটে। আর তোমার ওপর তাঁর নজরও আছে। একটা কথা সত্যি করে বলবে? কাল সুড়ঙ্গের মধ্যে যা দেখেছিলে তা বানিয়ে বলোনি তো?"

"না পটলা, বানিয়ে বলার মতো বুদ্ধি আমার নেই।"

"ওরে বাবা! যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তোমার বড় বিপদ।"

"কেন, বিপদ কিসের?"

"পাঁচজনে জেনেও গেছে কিনা যে, তুমি কবরের হদিস পেয়েছ।"

"কে রটাল কথাটা?"

"ও কথা কি চাপা থাকে? যাকগে, এখন কথাটা হল, সেই কবরের হদিসটা তো দরকার।"

হরি হেসে বলল, “হদিস কিছু শক্তও নয়। চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি।”

পটল সভয়ে চেয়ে বলল, “আমি! ও বাবা, আমি পাপী-তাপী মানুষ, পাগলা-সাহেব আমাকে ভস্ম করে ফেলবে। বরং আমি এখানে বসে থাকি। তুমি যাও গিয়ে জায়গাটা একবার দেখে একটু চিহ্ন রেখে এসো।”

হরি রাজি হল। পটল তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর চেয়ার তুলে ফেলল। মুখ-ঝাড়ুনি দিয়ে ছবিটাও সরিয়ে দিল। চাপা গলায় বলল, “জয় মা কালী।”

হরিবন্ধুর বুকটাও দুরদুর করছে। তবে কিনা পাগলা-সাহেব এ-পর্যন্ত তার উপকার ছাড়া অপকার তো কিছু করেনি! সে ধীরে-ধীরে সাহস সঞ্চয় করে সুড়ঙ্গে উঠে পড়ল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে বাঁ দিকে ঠিক বিশ পা হাঁটল গুনে-গুনে। হঠাৎ এক ঝলক তীব্র টর্চের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল তার চোখ। পরমুহূর্তেই লোহার মতো শক্ত দুটো হাত এসে দু’দিক থেকে তার দুটো হাত চেপে ধরল।

“কে? কে আপনারা?”

“চুপ, চেঁচিও না। চেঁচালে লাভও হবে না। চুপচাপ চলো, কবরটা আমাদের দেখিয়ে দাও।”

হরি লক্ষ করল, তাকে ঘিরে অন্তত আট-দশজন লোক। কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না ভাল করে, কারণ টর্চের আলোটা সোজা তার চোখে এসে পড়েছে। সে বলল, “কী চান আপনারা?”

“বলেছি তো, কবরটা।”

“কবর! আমি কবরের কথা কিছু জানি না।”

একটা বেশ নিরুত্তাপ মোলায়েম কণ্ঠস্বর বলল, “আমরা সবই জানি হরি। আমাদের সঙ্গে চালাকির চেষ্টা কোরো না। কবরটা দেখিয়ে দাও, তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব। কিছু পুরস্কারও দেওয়া হবে।”

“না দেখালে?”

“দুঃখের সঙ্গে এই সুড়ঙ্গে আমরা আর-একটা কবর খুঁড়ব, সে কবর তোমার। আর তোমার ওই চোর বন্ধুটিকে আমরা টুকরো-টুকরো করে শেয়াল শকুনকে খাওয়াব। আমাদের সঙ্গে সে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু তার ব্যবস্থা পরে হবে। এখন কবরটা আমাদের আগে দরকার।”

“এতগুলো লোকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও আশাই নেই। হরি খুব দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। তারপর বলল, ঠিক আছে। আমার হাত ছেড়ে দিন, আর আপনারা আমার পিছনে আসুন।”

“হাত ছাড়া হবে না। আমাদের বোকা পাওনি।”

“হাত না ছাড়লে আমি রাস্তা গুলিয়ে ফেলব। খুব হিসেব কষে গুনে-গুনে পা ফেলতে হবে। হাত ধরা থাকলে সেটা সম্ভব নয়।”

আচমকাই দুটো হাত ছেড়ে দেওয়া হল হরির। মোলায়েম কণ্ঠস্বরটি বলল, “ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মনে রেখো, তোমার দিকে তিনটে রিভলভার তাক করা আছে।”

হরি বিরক্তির সঙ্গে বলল, “বন্দুক-পিস্তল দিয়ে সব কাজ উদ্ধার হয়। টর্চটা নিবিয়ে ফেলুন, আমার অসুবিধে হচ্ছে।”

কী জানি কী ভেবে টর্চধারী হঠাৎ বাতিটা নিবিয়ে দিল। কিন্তু এমনভাবে আট-দশজন লোক হরিকে ঘিরে রইল যে, তাদের শ্বাস তার গায়ে লাগছিল, তাদের শরীরের উত্তাপও সে টের পাচ্ছিল।

যতদূর সম্ভব হিসেব কষে হরি যেখানে এসে দাঁড়াল, সেখানে নিরেট দেওয়াল। হরি একটু ভাবল। তার গোনায় কোনও ভুল হয়নি তো!

মোলায়েম কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"আবার সিঁড়ির গোড়া থেকে আসতে হবে। রাস্তাটা ভুল হয়েছে।"

"চালাকি ছাড়ো।"

হরি দৃঢ়স্বরে বলল, "আপনাদের জন্যই এমন হল। এবার আমাকে নিজের মনে কাজ করতে দিন। আপনারা তফাতে থাকুন।"

"বেশ ফন্দি।"

"ফন্দি মোটেই নয়। আপনারা ভালই জানেন, আজ পালাতে পারলেও কাল আমি ফের আপনাদের হাতে ধরা পড়ে যাব। আমি পালাব না। ভয় নেই, কিন্তু একটা কথা, কবরের মধ্যে পাগলা-সাহেব কিন্তু জেগেই বসে থাকেন।"

মৃদু একটু হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে গেল সকলের মধ্যে। মোলায়েম কণ্ঠস্বরটি বলল, "বেশ তো, একশো বছর আগেকার একটা মড়া যদি সত্যিই জেগে থাকতে পারে তবে তার একটা ইন্টারভিউ নেওয়া যাবে।"

আর একজন একটু স্তিমিত গলায় বলল, "পাগলা-সাহেব জেগে থাকবেন না। থাকলেও তাঁকে চিরদিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হবে।"

হরি একটু চমকে উঠল।

সিঁড়ির গোড়া থেকে হরি আবার পা গুনে-গুনে হাঁটতে লাগল। এবং কিছুক্ষণ পরে আবার গিয়ে ঠেকল নিরেট দেওয়ালে।

"এবার কী হল?"

"হরি মৃদু স্বরে বলল, "হচ্ছে না। গুলিয়ে ফেলছি।"

"নাকি চালাকি করছ?"

"তাতে লাভ কী? আবার দেখছি, ধৈর্য ধরুন।"

"ধরছি।"

হরি অন্তত দশবার চেষ্টা করল। একবারও কোনও রন্ধ্রপথ আবিষ্কার করতে পারল না। অথচ কাল রাতে...

চটাস করে তার গালে একটা চড় এসে এত জোরে ফেটে পড়ল যে, চোখে কিছুক্ষণ অন্ধকার দেখল হরি।

মোলায়েম গলা বলল, "হাঁটি-হাঁটি পা-এর খেলা এবার বন্ধ করো। আমরা সেই ছড়াটা জানি। ছুটেও না, হেঁটেও নয়, সাপের মতো। কাছেও নয়, দূরেও নয়, গভীর কত। আলোও নয়, অমাও নয়, যায় যে দেখা। আজও নয়, কালও নয়, ভাগ্যে লেখা। ঠিক কিনা?"

হরি জবাব দিল না। গালে হাত বোলাতে বোলাতে মনে-মনে ফুসতে লাগল।

মোলায়েম গলা বলল, "আমরা ভাগ্যে বিশ্বাস করি না। আমরা কাজে বিশ্বাসী। এই ছড়াটা একটা সঙ্কেত। আমরা যেখানে যেতে চাইছি সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে না। যেতে হবে সাপের মতো বুকে হেঁটে। আর জায়গাটা গভীরে, অর্থাৎ নিচু কোনও গর্ত বা পাতাল-ঘরে। সুতরাং

তোমার চালাকিটা খাটছে না।"

মাঝে-মাঝে টর্চের আলো জ্বলে উঠছে। সেই আলোর আভায় হরি লোকটাকে বুঝবার চেষ্টা করল। গলাটা যেমন নরম, চেহারাটা তত নয়। বেশ লম্বা-চওড়া শক্ত কাঠামোর চেহারা। দলের সবাই যে তাকে ভয় পায় তাতে সন্দেহ নেই। সে ছাড়া আর কেউ কোথাও কথা বলছে না।

মোলায়েম গলার স্বর শোনা গেল আবার, "কী, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে! "

"আমার কিছু মনে পড়ছে না।"

"ঠিক আছে, যখন মনে পড়বে তখন আমাদের ডেকো। ওরে, একে নিয়ে যা।"

সঙ্গে-সঙ্গে সাঁড়াশির মতো দুটো হাত এসে তার দুই বাহু ধরল। পিছন থেকে কে যেন তার মাথার ওপর দিয়ে একটা টুপির মতো জিনিস পরিয়ে সেটা টেনে নামিয়ে দিল গলা অবধি। মুখ-চোখ সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল হরির। পিছমোড়া করে তার দু হাতে একটা হাতকড়া পরানো হল খট করে। তারপর তাকে টানতে টানতে কোথা থেকে যে কোথায় নিয়ে যেতে লাগল এরা তা বিন্দুমাত্র আন্দাজ করতে পারল না সে। সুড়ঙ্গটা যে ভয়ঙ্কর জটিল এবং পিঁপড়ের বাসার মতো অনেক ভাগে বিভক্ত, তা জানে হরি। এখানে হারিয়ে গেলে ফিরে আসা খুবই কঠিন।

অনেক সিঁড়ি ভেঙে নামতে হল তাকে। ডাইনে-বাঁয়ে অনেক পাক খেতে হল। মিনিট-দশেক বাদে একটা জায়গায় তাকে দাঁড় করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল হাত। তার কিছুক্ষণ পরেই একটা দরজায় তালা দেওয়ার শব্দ হল।

হাতকড়া দেওয়া হাত দুটো পায়ের তলা দিয়ে গলিয়ে সামনে এনে ফেলল হরি। মুখের ঢাকনাটা খুলে চারদিকে চাইল। অন্ধকারে যতটুকু বোঝা গেল, এটাও একটা নিচ্ছিদ্র গোল ঘর। গোলাকার ঘর এই সুড়ঙ্গে অনেকগুলো আছে বোধহয়।

হরি দরজাটা পরীক্ষা করে দেখল। খুবই মজবুত কাঠের দরজা। এ-দরজা ভেঙে হাতিও বেরোতে পারে কি না সন্দেহ। তা ছাড়া বেরিয়ে লাভই বা কী? ওপাশে ওরা বন্দুক-পিস্তল নিয়ে পাহারায় আছে।

হরি মেঝের ওপর চুপচাপ উবু হয়ে বসে রইল। আশপাশ দিয়ে ইঁদুর ৮০।

দৌড়চ্ছে। আরশোলা গায়ে বাইছে। মেঝে থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসছে নাকে। মাটির কত নীচে, কোন পাতালে তাকে আনা হয়েছে তা বুঝছে পারছিল না হরি। কত রাত হয়েছে তারও আন্দাজ নেই। ছাতুর তালটা কখন হজম হয়ে গেছে। এতক্ষণে ঝুমরি বোধহয় গরম ভাতের থালা এনে তাকে খুঁজছে।

হরি ক্লান্তিতে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে চোখ বুজল। কখন ঘুমিয়ে পড়ল, তা তার খেয়াল নেই।

ঘুম যখন ভাঙল, তখনও চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। এই পাতালঘরে কোনও বাইরের আলো তো আসতে পারে না। ভোর হল কি না কে জানে! বড়ড খিদে পেয়েছে হরির। তার চেয়েও বেশি পেয়েছে তেষ্টা।

খুব ভয়ে-ভয়ে হরি অনুচ্চ স্বরে ডাকল, “কেউ আছেন? আমার বড় জলতেষ্টা পেয়েছে।”

তার গলার স্বর গভীর ঘরটায় গমগম করে প্রতিধ্বনিত হল। একটু বাদে দরজা ধীরে-ধীরে খুলে গেল। মোলায়েম কণ্ঠস্বর বলল, “জল নেই।”

একথায় যেন জলতেষ্টা আরও বেড়ে গেল হরির। সে বলল, “আমার তো কোনও দোষ নেই। আমাকে আটকে রেখেছেন কেন?”

“শুনেছি পাগলা-সাহেব তোমাকে পছন্দ করে খুব। তোমার বিপদ দেখলে সাহেব নাকি কবরে থাকতে পারে না, উঠে আসে ঘোড়ায় চেপে। আমরা তার জন্যই অপেক্ষা করছি। তোমাকে নয়, আমরা পাগলা-সাহেবকেই চাই।”

"এই কথা আপনাকে কে বলল যে, পাগলা-সাহেব আমাকে পছন্দ করেন?"

"কেন, তোমার চোর বন্ধু পটল দাস।"

"তাকে কোথায় পেলেন?"

মোলায়েম গলা একটু হাসল। বলল, "পেতে অসুবিধে হয়নি। সে তো তোমার ঘরে বসে চাতকের মতো ঊর্ধ্বমুখ হয়ে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। পিছন থেকে যখন আমার লোকেরা গিয়ে তাকে ধরে, তখন সে টু শব্দটিও করতে পারেনি।"

"পটলদা কোথায়?"

"আছে। তোমার পেয়ারের আরও লোকজনও এখন আমাদের কজায়। জগুরাম, তার বউ, দুটো বাচ্চা।"

হরি চমকে উঠে বলল, "তারা তো কিছু করেনি!"

"সেটা আমরা বুঝব।"

হরি হঠাৎ কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে একটা মেয়ের গোঙানি শুনতে পেল। সেইসঙ্গে দুটো কচি গলার ফোঁপানি। ওই কি ঝুমরি আর তার দুটো বাচ্চা? ভারী ঠাণ্ডা, ভাল মেয়ে ঝুমরি। তাকে কেন পাষণ্ডটা কষ্ট দিচ্ছে?

হরি কাতর গলায় বলল, "ওদের কেন ছেড়ে দিচ্ছেন না?"

"দেব। পাগলা-সাহেবের দেখা পেলেই দেব। আর যদি আজ রাতে পাগলা-সাহেবের হদিস না পাই তা হলে তোমাদের ঠিক এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমরা চলে যাব। অবশ্য প্রত্যেকের কপালের মাঝখানে একটা করে পিস্তলের গুলি চালিয়ে..."

হরি শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি দাঁড়াল। বলল, “শুনুন, নিজের চেষ্টায় পাগলা-সাহেবের কবর কেউ খুঁজে পায়নি। আমি পেয়েছিলাম আকস্মিকভাবে।”

লোকটা কথাটা বিশ্বাস করল না। একটু ঝাঁঝের গলায় বলল, “আমরা কতদূর মরিয়া তা বোধহয় তুমি এখনও বুঝতে পারছ না। ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে।”

লোকটা অন্ধকারে তার হাত ধরল। এরকম শক্তিমান হাত হরি আর দ্যাখেনি। আঙুল যেন ডাইস মেশিন।

পাশেই একটা ঘরের দরজা খুলে টর্চের আলো ফেলল লোকটা।

হরি দেখল, নোংরা ধুলোর ওপর মেঝেয় হাত-পা বাঁধা ঝুমরি পড়ে আছে। মুখে কাপড় গোঁজা। তার দু’পাশে দুটো বাচ্চা শুয়ে আছে। ঘুমের মধ্যেও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে মাঝে-মাঝে।

“এসো, পাশের ঘরে দেখবে এসো,” বলে লোকটা দরজায় তালা দিল।

পাশের ঘরে মেঝের ওপর পড়ে আছে জগুরাম। তার হাত-পা বাঁধা নেই বটে, কিন্তু বাঁধনের আর দরকারও নেই। জগুরামের শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। বাঁ হাতটা এমনভাবে মোচড়ানো যে মনে হচ্ছে ভাঙা। জগুরামের জ্ঞান নেই।

মোলায়েম গলা বলল, “খুব ভাল লোক নয় এ। খামোখা আমাদের সঙ্গে গা-জোয়ারি দেখাতে গেল।”

“ইশ। হয়তো বাঁচবে না।”

“বেঁচে থাকার দরকারটাই বা কী? এসো, তোমার বীর-পটলদার দশাও একটু দ্যাখো।”

লোকটা আর-একটা ঘর খুলে আলো ফেলল।

হরি অবাক হয়ে দেখল, পটল দাসের দুটো হাত দুটো দড়িতে বাঁধা, সেই দুই দড়িতে ঘরের মাঝবরাবর মেঝে থেকে অন্তত সাত ফুট ওপরে শূন্যে ঝুলছে। কপালে মস্ত ফোলা ক্ষতচিহ্ন, এখনও রক্ত গড়িয়ে মুখ ভেসে যাচ্ছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। খাস টানা এবং ফেলার ঘোরতর শব্দ হচ্ছে।

মোলায়েম কণ্ঠস্বর বলল, "কাল রাতে আমার দলের কয়েকজনকে আনাড়ি পেয়ে খুব ঘোল খাইয়েছিল। জানত না যে, ওস্তাদেরও ওস্তাদ আছে। একটু বেশি বীরত্ব দেখিয়ে ফেলেছিল বলেই এই শাস্তিটা ওকে দিতে হল।"

এতক্ষণ সহ্য করছিল হরি কোনওক্রমে। কিন্তু এই দৃশ্যটা দেখার পর তার মাথায় একটা রাগের আর দুঃখের পাগলা ঝড় উঠল। ঝুমরি, দুটো নিষ্পাপ বাচ্চা, সরল জগুরাম, পটলদা, এরা তো নিদোষ!

মোলায়েম গলা তার দিকে ফিরে বলল, "এদের তুলনায় তোমার প্রতি আমরা কিন্তু যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহারই করেছি। তাই না?"

রাগে দুঃখে হরির মুখে কথা ফুটল না।

মোলায়েম গলা বলল, "আরও দেখবে? এসো। এখানে অনেক ঘর আছে।"

লোকটা আর-একটা ঘর খুলে দিয়ে বলল, "এরা বাপব্যাটা তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছিল।

হরি দেখল, মেঝেতে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে পড়ে আছে ঝিকু-সদার। ঘরের এক কোণে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে গোপাল। তার মাথায় এখনও ব্যাণ্ডেজ। জ্ঞান নেই কারও।

মোলায়েম গলা বলল, "এরা বাপব্যাটায় পাগলা-সাহেব সেজে সাদা ঘোড়ায় চেপে এতকাল ধরে লোককে বোকা বানিয়ে এসেছে। আমাদেরও বানিয়েছিল!"

হরি অস্ফুট গলায় শুধু বলল, "কিন্তু গোপালের যে জ্বর!"

"জানি। তবে জ্বর তো আর মরে যাওয়ার পর থাকবে না। তখন গা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"কিন্তু আপনি এদের কেন মারবেন?"

"আমার কাছে মানুষ আর পিঁপড়েয় তফাত নেই। বাঁচিয়ে রাখলে অনেক ঝামেলা। শত্রুর গোড়া থেকে যাবে, সাক্ষী থেকে যাবে। আমি যখন যা করি তার চিহ্ন মুছে ফেলি। তবে যদি কবরটা দেখিয়ে দিতে পারো তা হলে অন্য কথা।"

"কী কথা?"

"কবরটার সন্ধান দিলে তোমাকে পুরস্কার দেব বলেছিলাম। আমি বাজে কথা বলি না। তুমি এদের প্রাণ পুরস্কার হিসেবে পেতে পারো।"

লোকটার দিকে অন্ধকারে হরি চেয়ে রইল। মুখটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু লোকটা মানুষ না দানব সে বিষয়ে সন্দেহ হতে লাগল হরির।

হঠাৎ তার মাথায় কী দুর্বুদ্ধি চাপল কে জানে, হরি তার হাতকড়া-পরা হাত দু'খানা তুলে আচমকা লোকটার কপালে বসিয়ে দিল।

অন্তত হরি ভেবেছিল তাই। কিন্তু অতিশয় ধূর্ত লোকটা কী করে যেন চোখের পলকে টের পেয়ে একটা হাত তুলে খপ করে হরির হাত ধরে ফেলল, যেভাবে সাপুড়ে বিষাক্ত সাপকে ধরে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই অন্ধকার আনাচকানাচ থেকে আট-দশজন লোক ছুটে এল।

হরির মাথার আগুনটা নিবল না। সে হাত নাড়তে না পেরে ডান পায়ে একটা লাথি ছুঁড়ল। লাথিটা শূন্যে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল।

তিন-চারজন লোক পিছন থেকে ধরল হরিকে।

হরি বুঝল, এই খুনিরা এরপর তাকে আর আস্ত রাখবে না। মরতেই যদি হয় তো লড়ে মরাই ভাল।

হরি আর বাছবিচার করল না। অন্ধকারে শিকলে বাঁধা হাত আর দু'খানা মুক্ত পা নিয়ে সে যথেচ্ছ চালাতে লাগল চারদিকে। অবশ্য চারদিক থেকে মারগুলোও ফিরে আসতে লাগল।

হরি মার খেতে-খেতেও হাতকড়া পরা হাত দুটো দিয়ে পট করে জড়িয়ে ধরল মোলায়েম কণ্ঠস্বরের গলাটা। তারপর সকলে মিলে একটা বিশাল মানুষের পিণ্ড পাকিয়ে গেল।

সেই পিণ্ডটা গড়াতে লাগল। গড়াতে লাগল। একটু ঢালু জমি না? গড়াতে গড়াতে ঢালু বেয়ে নেমে যেতে লাগল সবাই।

কে যেন চেঁচাল, "সামালকে!"

কিন্তু সামলানো যাচ্ছিল না। পিছল ঢালু বেয়ে তারা সকলে পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি অবস্থায় অসহায়ভাবে গড়িয়ে যেতে লাগল। অন্ধকার রন্ধ্রপথটা যে কতদূর গেছে!

ঝং করে বিকট একটা শব্দ হল।

কিসে এসে ঠেকল তারা?

ধীরে-ধীরে লোকগুলো উঠে বসল। চারদিকে তাকাতে লাগল। হরি নির্নিমেষ চেয়ে ছিল কাঠের চৌকো দরজাটার দিকে। দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। না, বেশি নয়। সামান্যই।

আর সেই ফাঁক দিয়ে এক অদ্ভুত নরম, মায়াবী নীল আলো এসে ভরে দিল সুড়ঙ্গ।

মোলায়েম গলা অবাক হয়ে বলল, "এ কী?"

হরিবন্ধু হতাশায় ভরা গলায় বলল, "কবর। পাগলা-সাহেবের কবর।"

দরজাটা ঝটাং করে খুলে দিল মোলায়েম গলার লোকটা।

নীচে সেই গোল ঘর। কাঠের বাক্স। একটা ডেকচেয়ার। সব যেন নীল আলোয় ডুবে আছে। ডেকচেয়ারে রোগা লম্বা মানুষটা আজও শোওয়া। কোলে খোলা বাইবেল।

লোকটা খুব ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ওপর দিকে চেয়ে গমগমে প্রতিধ্বনিত গলায় বলল, "তোমরা কিছু চাও? নেবে যিশুর এই চিহ্ন?"

গলা থেকে আশ্চর্য সুন্দর একটা সোনার ক্রস খুলে আনল লোকটা। ডান হাতে ক্রসটা উঁচু করে তুলে ধরল ওপর দিকে। এত দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল, হিরে বসানো ক্রসটায় যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

"এসো, ধীরে ধীরে নেমে এসো। আলোর সিঁড়ি পাতা আছে। এসো।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো একে-একে লোকগুলো নেমে যেতে লাগল।

হরি জানে, সিঁড়ি নেই। সিঁড়ি ছিল না। তবু লোকগুলো যেন ঠিক সিঁড়ি বেয়েই নেমে যেতে লাগল। কারও মুখে কথা নেই। মূক, বাক্যহারা, পলকহীন।

নীচের নীল ঘরের মধ্যে এক অদ্ভুত নীল আলোর সমুদ্র যেন। লোকগুলো নামছে, নামতে নামতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে নীলের মধ্যে। বুদ্বুদের মতো।

পাগলা-সাহেব একা ক্রসটা তুলে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু কেউই শেষ অবধি তাঁর কাছে পৌঁছল না।

সাহেব ধীরে-ধীরে ক্রসটা আবার গলায় পরে নিলেন।

গমগমে কণ্ঠস্বর বলে উঠল, “বিশ পা হেঁটে যাও পিছনে। রাস্তা পাবে। বিরক্ত কোরো না। আমি এখন বাইবেল পড়ছি।”

ভয়ে নয়, অদ্ভুত এক ভালবাসায় ভরে গেল হরির বুক। টপটপ করে চোখের জল পড়তে লাগল।

দরজাটা সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে হরি ফিরে আসতে লাগল। বিশ পা।

ঘটনার ছ’ মাস বাদের কথা। স্কুলের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোল। হরিবন্ধু ফাস্ট।

খবরটা চাউর হতেই হেডস্যার ডেকে বললেন, “এইট-এ নয়, তোমাকে নাইন-এ তুলে দিচ্ছি, ডবল প্রোমোশন। যাও, মাস্টারমশাইদের প্রণাম করে এসো।”

ঝিকু-সদার তার সাদা ঘোড়াটা স্কুলেই নিয়ে এল। বলল, “এটা চড়েই আজ বাড়ি ফিরবে। এটা তোমাকে উপহার দিলুম।”

ঝুমরি বিকেলবেলায় আজ এত বড় একটা ছাতুর তাল মেখে আনল যে, বেড়াল ডিঙোতে পারে না। আর বলল, “রাতে তোমার জন্য ভোজবাড়ির রান্না হচ্ছে। বন্ধুদের ডাকো আজ নেমন্তন্নে। সবাইকে খাওয়াব।”

তা রাতে নেমন্তন্নে হুল্লোড় হল মন্দ নয়। শুধু পেটপুরে খেয়ে বিদায় নেওয়ার সময় পটল দাস একটু খিঁচিয়ে উঠে বলল, “এ-ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল হয়ে গোল্লায় গেল। বলি সেইসব কায়দাকানুন, বায়ুবন্ধন, প্যাঁচপয়জার শিখবে না?”

“শিখব পটলদা। তোমাকেও পড়াশুনো শেখাব।”

তার রেজাল্টের কথা জেনে বাবা খুশি হয়ে লিখলেন, “এবার তা হলে তোমাকে পুরনো স্কুলেই ফিরিয়ে আনব। আর কষ্ট করে মোতিগঞ্জে থাকতে হবে না।”

হরিবন্ধু তৎক্ষণাৎ জবাব লিখল, “পাশ না করে আমি মোতিগঞ্জ ছেড়ে কোথাও যাব না।”